প্রেসি
কলেজ
পত্রিকা

ত্রয়স্ত্রিংশ খণ্ড :: ১৩৬

যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ॥ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখার গতি প্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণের পূর্বে যুদ্ধোত্তর কথাটির তাৎপর্য অনুধাবিত হওয়া দরকার। এবং এর বিশেষ অর্থদ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা যুদ্ধোত্তর কথাটির সাধারণ অর্থব্যবহৃতির মধ্যেই নিহিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ অনেক ঘটেছে, তার ফলও এক একটা জাতির জীবনে সর্বাতিশায়ী হয়েই দেখা গেছে। তৃতীয় নেপোলিয়নের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ও আমাদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কিন্তু এসব যুদ্ধের ফলশ্রুতি সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত করে আন্দোলিত হয় নি। কি মানসিকতার ক্ষেত্রে কি বাহ্যিক জীবনের আচরণের ক্ষেত্রে গত দুই মহাযুদ্ধ যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে এর বিশেষত্ব অনন্ত ও অনস্বীকার্য।

আমাদের পূর্ব সংস্কার, রুচি বা আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলল এবং এর ফল সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরো প্রকটমান রূপপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবীর ভাবের সঙ্গে তাই উপস্থিত হয়েছে দ্বন্দ্ব। মানবমনের হৃদয়বৃত্তিজাত নৈতিকতা, সততা, আন্তরিকতা অন্তরালবর্তী হয়ে গেল। ইহা মানব মানসিকতাকে এমন ভাবে আচ্ছাদিত করলো যে সমাজ বা মানসিকতার পুনর্গঠন পথের নিশানা দেওয়া আজ অসম্ভব। পুরাতন আদর্শ বা সনাতন জীবনবাদ সবই এই পরিবর্তিত সৃষ্টির নিরিখে অবাস্তবকল্প। চিরাচরিত অর্থনৈতিক, সামাজিক নৈতিক শাশ্বত কল্যাণবোধ, সৌন্দর্যবোধ বা হৃদয়ের স্নিগ্ধতা সম্পূর্ণ অপসারিত হলো। দ্বিজেন্দ্রলাল সৃষ্ট চাণক্যের সুন্দরী বীভৎসতার মত। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে বীভৎসতাকেই বসানো হলো সৌন্দর্যের আসনে। নৈরাশ্যবাদ বা বিকৃত জীবনবোধ প্রেরণায় যে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয় আর তার মধ্যে যে জীবনের রূপ, সমাজের রূপ প্রতিফলিত তা খণ্ড চূর্ণ, সমগ্রতার আলো দেখাতে অক্ষম। যেখানে বিরাজ করে আদর্শহীনতা,

মানবজীবনের মহিমা সম্পর্কে প্রত্যয়াভাব, সেখানে বড় সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানবজীবনকে সুন্দরতর করা, মানব জীবনের পথকে গতিময়তার মধ্যে চালিত করা, কল্যাণবোধে প্রেরণা যোগান।

বড় কাব্য বা সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যার আভাস পাওয়া যায়। সংহতিই অসাধ্যসাধনকামী মনের দূরাভিযানের আলোককে বৃত্তসুষমার রূপ দেয়। এ যুগের সাহিত্যে মানব প্রকৃতির অনুসন্ধানই মুখ্য হয়ে উঠলো—আর এর মূলে রয়েছে জীবনের আশাভঙ্গতা।

যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে মানুষের প্রকৃতি পাশবিক স্তরোত্তীর্ণ হতে পেরেছে কি না তাতে সন্দেহ আছে। আকাশচারিতা ও নিম্নচারিতার সংশ্লেষণ না ঘটলে মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। আকাশচারিতা বা উচ্চভাবকল্পনাকে চিন্ময় আখ্যা দিয়ে আমরা অবাস্তব বলে থাকি। কিন্তু তা সত্যিকারের অবাস্তব নয়—জীবনের একটি দিকও বটে। Aristotle একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, গাছের মূল যেখানে গেছে সেইটেই তার পরিচয় নয়, ফলেই তার পরিচয়। মানুষের ব্যাপারেও তার প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রবৃত্তিই তার প্রকৃত পরিচয় নয়। সে সূর্যালোক-স্নাত, মহৎজীবনের আলোকপ্রাপ্ত। তাই এর সুষ্ঠু সমন্বয়েই তার পরিচয়।

বাঙলা দেশে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল না ফললেও তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ তার জীবনেও অনেক পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল। যুদ্ধের ফলে যে অর্থসংকট দেখা দিয়েছিল বিশ্বের সর্বত্র, বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রভাবটা অতটা সর্বাতিশায়ী ছিল কি না, সাহিত্যে সঞ্চারিত মনোভাবটা আমাদের অনুভূতির নির্ভেজাল জিনিস কি না, না, সাময়িকতার অনুবর্তন—এ প্রশ্ন বিচারের মানদণ্ডে সাহিত্যের আন্তরিকতা ও উৎকর্ষ বিচার করতে হবে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে যে জীবনবাদ আমরা পেয়েছি তার প্রভাব যে পূর্বনির্ধারিত 'থিওরী' ভিত্তিক তার কোন প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য আমাদের সাহিত্যে নেই।

Aristotle নাটক, কাব্য বা অন্যান্য সাহিত্যরূপের কতকগুলো রূপ নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন। যদিও এ সব রূপাদর্শের ক্ষেত্রে আজ পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু উপন্যাস সম্বন্ধে সে রকম কোন নির্ধারিত রূপ নেই। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'পামেলা'। রিচার্ডসন জানতেন না যে এটি কি। চিঠিপত্রের মধ্যে অন্তরবিকাশের মধ্যে উপন্যাসের উদ্ভব। এর আঙ্গিক বা গঠন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি তখন ছিল না। উপজীব্যের বিশাল ব্যাপ্তি—মোটের ওপর এতে মানবিক এমন একটা আবেদন থাকা চাই যাতে জীবনের বা সমস্যার জীবন্ত কল্পনা থাকবে—আমাদের সহানুভূতি জাগতে পারে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট-এ এসে

উপন্যাসের একটা বিশেষ রূপপ্রাপ্তি ঘটে। এরপরে প্রায় অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই আদর্শ বজায় ছিল। তারপর যুদ্ধোত্তর জীবনে আবার উপন্যাসের রূপহীনতা চোখে পড়ে—পরিবর্তমান জগৎ ও জটিল সমস্যা জালের ঘূর্ণাবর্তেই এই পরিবর্তন। নিশ্চিন্ত নির্ভরতার অভাব অর্থাৎ জীবনের প্রতিমুহূর্তের অনিশ্চয়তাই এই পরিবর্তনের মূলে। জীবনের গভীরতা থেকে গতিশীলতাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বর্তমান সাহিত্যিকদের কাছে।

জীবন গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকতার ছায়াতলে। জীবনটা শতকরা আশি ভাগ পুরাতন ঐতিহ্যানুসারী, আর কুড়ি ভাগ বিশিষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। জীবনের পরিচয়ে সমাজচেতনা, পারিবারিক আদর্শ, বংশানুক্রম, এগুলোকে বর্জন করে যদি ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয়ই শুধু দেওয়া হয় তবে তা আরোপিত বলেই মনে হয়। রিক্তপত্র-বৃক্ষের ফলের মতই তা অস্বাভাবিকতাবাহী। এ সবকে অস্বীকার করে যদি ব্যক্তি-সর্বস্ব জীবনচিত্র আঁকা হয় তবে তার মধ্যে গভীর জীবনপ্রত্যয়ের অভাব খেয়ালী মনেরই পরিচয় মেলে। এ জাতীয় উপন্যাস ব্যক্তি-চরিত্রকে মুখ্য না করে ঔপন্যাসিক একে কোন বিশেষ আন্দোলনের পটভূমিকায় রেখে এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন, করুণা সৃষ্টির প্রয়াস করেন বা সমষ্টিগত জীবনের একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করেন। 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং' সাহিত্যের অমরতা বিধান করতে পারে না। বর্তমানে শুধু এই চোখের দেখাটাই মুখ্যতাপ্রাপ্ত হয়েছে, এর যে অন্তর্বর্তী রূপান্তর, সেটা ঘটবার অবকাশ পায় না। সাহিত্যের আদর্শ আধুনিক যুগেরও আছে তবে এখনো পরিস্ফুট নয়। মানুষের প্রাণশক্তি যেমন অখণ্ড অবিভাজ্য, এর সঙ্গে অবয়বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার একটা সামঞ্জস্যে উপনীত না হলে সেটা যেমন পুতুল খেলা—তেমনি জীবনের ক্ষেত্রে বাইরের সামঞ্জস্য চাই।

বিভূতিভূষণের জীবনের সহজ মহিমা আছে। শাশ্বত আত্মা মানুষকৃত পাপের দ্বারা কলঙ্কিত নয়। মানুষের সহজ মহিমা, সহজ মর্যাদা বোধকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি, তাঁর মতে অভাব-রিক্ততায় মানবাত্মা বিচলিত হয় না। তুচ্ছ প্রাত্যহিক জীবনের পরিবেশ থেকে, প্রকৃতি থেকে বিভূতিভূষণের জীবনচেতনা মহৎ জীবনের মহিমা আহরণ করে।

জীবন সত্য প্রতিফলিত করা, মানব জীবনের নব পরিচয়ের প্রতিশ্রুতি বা পুরাতন পরিচয়ের উপস্থাপনার স্পষ্ট শিল্পকৃতিই ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। মানব জীবনের পরিচয় এত দ্রুতপরিবর্তনশীল নয় যে আমরা প্রতি উপন্যাসে এই জীবনের নব বোধের রূপায়ণের আশা করতে পারি। পুরাতনের মধ্যে নতুনের বিস্ময়বোধ জাগাতে পারেন লেখকরা। এবং এটি করতে হলে একটা আদর্শ স্থিরীকৃত হওয়া

চাই। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত হলেও তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি শিল্পসমৃদ্ধ রচনা, জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রবণতা। কিন্তু 'fundamental life sense'-এর অবকাশ নেই এ সবে। তবে এই বোধকে সাহিত্যে সঞ্চারিত করতে হলে চাই সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি—জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়নের স্বীকৃতি, প্রাত্যহিকতার আড়ালে লুক্কায়িত আছে যে জীবন সত্য তার আবিষ্কৃতি।*

রবীন্দ্রনাথের 'রেখার কাব্য' ॥ অনুপ মুখোপাধ্যায়

বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে ; বললেন : ঐটুকু, আর হাত দেব না, ব্যস—তোমরা তৈরী করে নাও। এই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট। রবীন্দ্রনাথ জীবনভোর সেই আর্টের সাধনাই করে গেছেন। গদ্যে পদ্যে গানে অশেষ প্রকারে আপনাকে প্রকাশ করেও তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারল না। তাই তার জন্যে শেষ বয়সে তাঁকে আবার রঙ ও রেখার সহায়তা গ্রহণ করতে হলো। তাঁর কলাসৃষ্টি অজস্রতায় চারিদিক ভরিয়ে দিয়ে, তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করল। কবিতায় তিনি যেমন একটি সমগ্র রূপ দিয়েছেন, রেখা-চিত্রে তেমনি জগৎটা বস্তু-প্রবাহের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে আবর্তিত হতে হতে কী করে রেখা ও রঙের মিলনে নানাবিধ আকৃতিতে পরিণত হচ্ছে, তারই ইতিহাস তিনি আঁকলেন। যদিও বাস্তবকে নিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের কারবার, তবুও ব্যক্তিত্ব সকল প্রকার তথ্যকে অতিক্রম করে নিজেকে স্থায়ী করবার প্রয়াসে অসীমের ভাণ্ডার থেকে অমৃত-পাত্র হরণ করে পান করে। এই অমৃতের তৃষ্ণাই মর্ত্য-রাত্রির পরপার হতে বিশ্ব-সত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শিল্পীর ব্যাকুল চিত্তকে অহরহ আকর্ষণ করত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর চিত্রশিল্পকে 'রেখার কাব্য' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে কবিচিত্ত ও শিল্পীচিত্ত—দুইয়েরই যুক্তপ্রকাশ আশ্চর্যভাবে দেখা

---

* আশুতোষ কলেজের সাহিত্য-সংস্থা 'রবীন্দ্র পাঠচক্রে'র উদ্যোগে গত ১৭. ৪. ৫৮ তারিখে যে সাহিত্য সভা হয়, তারই প্রধান অতিথিরূপে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাষণটি প্রদান করেন। লেখাটি 'রবীন্দ্র পাঠচক্রে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত। এর প্রতিলেখক তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্র শ্রীশতদ্রুশোভন চক্রবর্তী। সম্পাদক।

যায়। রেখা নিয়ে খেলা করতে করতেই রবীন্দ্রনাথের 'রেখার কাব্যে'র জন্ম। কিন্তু তিনিও প্রথমে বিশুদ্ধ ফর্মে আকৃষ্ট হন। প্রথমে রেখা টানতে টানতে একটা কিছু হয়ে ওঠাই তাঁর আনন্দের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে অর্থহীন এলো-মেলো রেখা তাঁর চোখকে পীড়িত করেছিল—তার সঙ্গে আরও কতকগুলো রেখা জুড়ে দিলেই তা যে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক একটা চেহারা পায় এবং আরও কিছু যোগ করা মাত্র তা ভেঙে যায়, এর মধ্যে তিনি একটি বড় সত্য দেখতে পান। দেখতে পান এতে প্রকৃতির সৃষ্টিরীতিরই ছায়াপাত হয়েছে—প্রকৃতিতে অবিরাম যে ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে, এটাও তার প্রতিচ্ছবি। এই আবিষ্কারের ফলে তাঁর মনে এক অপূর্ব আনন্দ জাগল। কল্পনা ও অনুভূতির পথে তিনি এ সত্য কবি-জীবনের গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলেন—"ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা", কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ দেখলেন, তা কি করে হয়। এরপর থেকে তিনি এই রূপ গড়া আর রূপ ভাঙার আনন্দে মেতে উঠলেন। এতে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আবার নতুন পথে আত্মীয়তা অনুভব করলেন। এই আনন্দের বাণী আছে তাঁর চিত্রশিল্পে। 'পরিশেষ' পুস্তকে "আলেখ্য" কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটন লেখায়
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি।"

রেখার ওপর রবীন্দ্রনাথের বেশ দখল ছিল। প্রমাণস্বরূপ "খাপছাড়া" বইয়ের ছবিগুলি ধরা যায়। এই বইয়ের ছবিগুলিতে অসংখ্য রেখার বৈচিত্র্যময় সমাবেশ এবং স্বল্প রেখার অনাড়ম্বর সরল আবেদন দুই-ই মনকে বিস্মিত করে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রে রেখার পরই হল ছন্দের স্থান। রেখার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দসুষমাও তাঁর চিত্রগুলির প্রাণবন্ত। ছন্দ বলতে গতির যতি ও ভঙ্গিমাকেই বোঝায়। প্রকৃতির সৃষ্টিগুলিতেও প্রাকৃতিক ছন্দ বর্তমান, তা না হলে এগুলি আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারত না এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমরা বিমুগ্ধ হতাম না। রঙ্ আর রেখার বিশিষ্ট একটা ভাষা আছে, আবেদন আছে, যা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পক্ষে কোন প্রয়োজনের থেকেই কম নয়। সৃষ্টির বেদনা ভরা বুক নিয়ে অন্তরীক্ষে প্রসারিত চক্ষু দিয়ে যে মানুষ অসূর্যম্পশ্য গুহার হাতে আঁকা এই বিশ্ব-ছবিটি চেয়ে চেয়ে দেখে, নিঃশব্দে একটা আবেদন এসে পৌঁছয় তার অন্তরের নিভৃতে—সেও রঙের ভাষায় রেখার বন্ধনে বন্দী করতে চায় ওই দেখাকে আর দেখার আবেদনকে।

রঙ্ তাঁর ছবির রূপের কাণ্ডারী। ঘন গভীর রঙের 'ব্যাকগ্রাউণ্ড', তারই মাঝে আলোর রঙে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলা—এই হলো রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির মনোহারিতা। এ একটা স্টাইল। রেম্ব্রাণ্টের ছিল এই স্টাইল, ঘনঘোর দৃশ্যপটের নিস্তব্ধতা ভেদ করে মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত অবয়বের একটুখানি কলরব।

আনন্দ শিল্পকলার একটা বড় জিনিস। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আমরা কোন জিনিস দেখে আনন্দ পেয়ে তার রূপ নিয়ে, রঙ্ নিয়ে, ভাব নিয়ে, যখন তা লেখা, আঁকা বা গানের মধ্যে দিয়ে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, তখনই তা আর্টের বা সার্থক শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। Herbert Read এই বিষয়ে বলেছেন—"But it should always be remembered that the appeal of art is not to concious perception at all, but to intuitive apprehension. A work of art is not present in thought, but in feeling, it is a symbol rather than a direct statement of truth." রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিতে তাঁর নিজস্ব symbol-ই রয়েছে।

কবি নিজেই তাঁর শিল্পীসত্তাকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্র উপভোগ করতে এবং তার শিল্পমূল্য সম্যক উপলব্ধি করতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ সাহায্য করবে :

"যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ওই রকম।···আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানা রকম চেহারা ধরছে—তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার।···গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই—স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা।···আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ।···তার রহস্যের অন্ত নেই।"

এই আনন্দ, এই রহস্যের বাণী বহন করছে রবীন্দ্র-শিল্প। যা ছিল শুধুই আকার, তার মধ্যে ফুটে উঠল শিল্পীর আনন্দ ও রহস্যের অনুভূতি, আর সেই মুহূর্তেই তার রেখারূপ ও বর্ণরূপ আর্টের ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াল। তার কারণ এই যে সম্পূর্ণ অচেতন মন আর্ট সৃষ্টি করে না। আর্ট হতে হলে তার পশ্চাতে সচেতন মন থাকা চাই। এই চেতনার তারতম্য থাকতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে, সৃষ্টির কোন মুহূর্তে সাময়িকভাবে চেতনা আচ্ছন্নও থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা অচেতনতা নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর আর্টকে বুঝতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন, কিংবা

বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি তাঁর আর্ট সৃষ্টির ইতিহাস বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

ঠিক এই জাতীয় ইতিহাস পাই পিকাসোর আর্টে, পিকাসোর নিজের কথায়। তিনি বলেছেন: "I see for others; that is to say, so that I can put on the canvas the sudden apparitions which force themselves on me, I don't know in advance what I am going to put on the canvas, any more than I decide in advance what colours to use....."

রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় থাকলে রবীন্দ্রনাথের ছবি উপলব্ধি করে রসগ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়। হয়তো আর্টে যাকে ক্র্যাফট্‌ম্যানশিপ বলে, রবীন্দ্র-শিল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটায় তাঁর একথা মনে হয়েছে। কবির কথা থেকে জানতে পারা যায় যে চিত্রগুলি তাঁর খেয়ালের সৃষ্টি। তিনি বলেছেন: "শিক্ষা বলতে যদি আমি কিছু পেয়ে থাকি, তা হচ্ছে ছন্দের শিক্ষা, চিন্তায় এবং ধ্বনিতে। আমি বুঝেছিলাম যে, যা বিক্ষিপ্ত এলোমেলো এবং অকিঞ্চিৎকর তাকেই ছন্দ প্রাণ দিয়ে সত্য করে তোলে।" রঙ, তুলি, কলম বা পেন্‌সিল নিয়ে নিজের মনে খেলা করতে করতে তিনি নিজের অজান্তে রচনা করতেন 'রেখার কাব্য'। কিন্তু এই যে শিল্প-উপকরণ নিয়ে খেলা করা এতেই এক অভিনব কলাসৃষ্টি সম্ভব হলো। একে কিন্তু শিশুজনোচিত খেলা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে এ কথাও ঠিক যে, সমস্ত প্রেরণাপ্রাপ্ত আর্টেরই মূলে আছে শিশুর মত সরল, পবিত্র, সংস্কারমুক্ত মন। কেবল আর্ট নয়, তাঁর যাবতীয় প্রেরণাপ্রাপ্ত কবিতা সম্পর্কেই একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"His art had something volcanic about it. It came out like a volcanic eruption—all that had been accumulated in the past and its very impetus gave it form, its very force shaped its course." একথা সম্পূর্ণ সত্য। Mr. Herbert Read তাঁর "The Meaning of Art" পুস্তকের এক যায়গায় বলেছেন—"What we really expect in work of art is a certain personal mind, at least a distinguished sensibility." রবীন্দ্রনাথের 'রেখার কাব্যে' এই personal element-ই বড় কথা।

সাধারণভাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পসৃষ্টির এবং তাই শিশুদের আঁকা ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতি-হাসিক ছবিতে যেমন কোন বিষয় বস্তুর মূল জিনিসটি ছবির মধ্যে পাওয়া যেত, কিন্তু অবিকল সেই জিনিসের প্রতিচ্ছবি থাকত না, রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও তেমনি। আবার শিশুদের আঁকা ছবিতেও অনেকটা তাই। এদের ছবিও খুব সরল।

অতি সাধারণ, মোটামুটি যেটুকু রেখা বা রঙ, না হলে একটি বিষয়কে বোঝান যায় না, সেইটুকুই ছবিতে থাকে। বাহুল্য থাকে না। সারল্য রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির একটি বড় জিনিস। কিন্তু তা হলেও এই শিল্পসৃষ্টিকে 'শিশুজনোচিত' বলায় বিপদ আছে। ধরা যাক্, রবীন্দ্রনাথের নাম গোপন রেখে শুধু তাঁর ছবিগুলি দেখা হচ্ছে ছোটদের ছবির সঙ্গে মিশ্রিত করে। এমন অবস্থায় কি রবীন্দ্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্য কিছুই থাকবে না? তাই যদি হবে তা হলে মুকুল দে যে বলেছেন, "......an entirely new departure in representing the reality of life with his own vigorous master-strokes which knows know faltering." এ কথাটি সমর্থন করা যায় কি করে? এই সঙ্গে আরও দু'একটি মত বিচার করা যাক: "বার্মিং হাম মেল"-এ কেইন্‌স্ স্মিথ্ বলেছেন:

"......marvellous example of the sense, of balance and of harmony ... ..."

যোসেফ সাউদল:

".. ...the work of a powerful imagination seeing things in line and colour as the best Oriental sees them, ..."

ফোসিশে সাইট্টং:

"The way Tagore coloured these......displays the educated sensitive taste of the oldest culture."

এ সবই তো পরিপক্ব শিল্পীর উদ্দেশ্যে বলা। এগুলির মধ্যে শিশুব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ যে ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই বিশেষ শিল্পরীতি বুঝতে হলে তাঁর ছবিগুলির আলোচনা প্রয়োজন। তিনি তাঁর শিল্পকৃতির মাধ্যম হিসাবে চার ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করেছেন—(১) প্রাকৃতিক দৃশ্য, (২) মানুষের প্রতিকৃতি, (৩) জীবজন্তুর ছবি, (৪) অদ্ভুত কিছু।

তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির শিল্পরীতিতে অলঙ্করণের আভাস বর্তমান। পার্স-পেক্‌টিভ তিনি মোটেই মানেন নি। বিচিত্র রঙ্ ও রেখার সমাবেশ করে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের আবহাওয়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ছবিগুলি আলো-ছায়ার সমন্বয়ে গঠিত সাদা-কালোর বিরহ-মিলনের খেলা।

মানুষের ছবি বহু বিচিত্র রকমের তিনি এঁকেছেন। একজন শিল্পীর পক্ষে একই বিষয়বস্তুর এত বিভিন্ন ধরণের প্রকাশ বিস্ময়কর। তার কতকগুলি ভীষণ আকারের, আবার কতকগুলি তার উল্টো, আলঙ্কারিক। জ্যামিতির বাঁধাধরা

নি ছবি আঁকেন নি। তাঁর এই প্রতিকৃতিগুলির
প্রকাশ। এই বিষয়ে প্রতিমা দেবী এক জায়গায়
াধরা নিয়ম মানে নি বলেই তাদের প্রকাশভঙ্গি
অবাধ। সাধারণতঃ আর্টিষ্টরা যে-সব ভাবভঙ্গিকে
বং তাঁদের প্রকাশভঙ্গিতে যে সনাতনীয় ছাপ
ধারণ পথ এড়িয়ে নতুন পথ নিয়েছে।"
লিও বাস্তবজগতের জীবজন্তুর অনুকরণ নয়—
ই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন।
লি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কল্পনার সৃষ্টি। প্রকৃতির
এগুলি খামখেয়ালী মনের বিচিত্র প্রকাশের
া ছবিগুলির বিশেষত্ব। ইম্যাজিনেটিভ্ চিত্রগুলিতে
ুস্‌কি-র মিল দেখতে পাওয়া যায়।
করে থাকে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রশিল্প
চিরন্তন প্রবৃত্তি মানুষের শিল্প-প্রেরণাকে সঞ্চালিত
র সদ্যস্ফূট প্রকাশভঙ্গী, একটা নবযুগের আগমন-
ব শিল্পসৃষ্টি হয়েছে, সকলের মধ্যে একটা মূলগত
কে আছে ভাব, আর একদিকে আছে সেটিকে
কিন্তু আধুনিক যুগে ভাব ও আঙ্গিক উভয়ের
ক্ষেত্রে একটা যেন বিপর্যয় দেখা যায়। কিন্তু,
াগে ভাবনা, পরে তার প্রকাশ আঙ্গিকের ভিতর
খা যায়, প্রথমে আঙ্গিকের প্রকাশ, পরে তাতে
াও বলা চলে যে এঁদের কারো কারো সৃষ্টিতে
ও ব্যবধান নেই, উভয়ে মিলে একটি অভিন্নত্ব
বলে গেছেন : প্রেরণাটাই সব, আঙ্গিকটাই সব,

াসৃষ্টির উদ্দেশ্য তো রস বিতরণ—দর্শক হিসাবে
কোন রসের সন্ধান না পাই, তবে তো তাঁর

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর

সম্পাদক

শ্রীঅজয় গুপ্ত

সহঃ সম্পাদক

শ্রীনির্মল রায়

ত্রয়স্ত্রিংশ খণ্ড

১৩৬৩

Printed by Prof. Parimal Kar at Navana Printing Works Private Limited,
47, Ganesh Chunder Avenue, Calcutta 13, and also published by him from
92, Shyamaprosad Mukherjee Road, Calcutta 26.

কয়লা-তীর্থে — নির্মলেন্দু দত্ত ৫৯
তাম্রলিপ্তে একদিন — দুর্গাশঙ্কর পাণ্ডা ৬৫
গিরিডি — দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী ৬৮

গ্রন্থ-সমালোচনা ৭২
প্রতিবেদন ৭৬
সম্পাদকীয় ৮১

ENGLISH

Second South East Asia Training Project in Work Camp Methods and Techniques — Ramaprasad Mookherjee 95
A New Light is Spreading over the Dark Continent — Indrajit Sen 99
An Unforgettable Moment — Raman Bahri 103
O Transcendant Life — Asit Ghosh 105
The poetry of Wordsworth — Bhupendranath Haldar 106
Reflections on Philosophy — Achintya Chattopadhyaya 109
Sputniks in Outer Space — Umesh Chandra Gupta 112

Reports 116
Editorial Notes 125
Important Additions to our Library 129

हिन्दी

अमर शहीद भगत सिंह — विष्णु प्रसाद मुरारका १२१
एक अंतर्द्रष्टा कैमेरा — जिनेन्द्रकुमार नवलखा १२२
तेरी मस्जिद, मेरा मन्दिर — "बुद्धदेव" १२४
कफन की चोरी — प्रकाशचन्द्र मोदी १२५
खाद उत्पादक सिन्दरी — रामजन्म सिंह १२६

Principal Panchanan Sinha

Born : January, 1886 Died : December, 1957

১ বিবেকানন্দ রক (কন্যাকুমারী)—রজত মিত্র। ২ পাড়ি—উমেশচন্দ্র গুপ্ত।

১ বিবেকানন্দ রক (কন্যাকুমারী)—রজত মিত্র। ২ পাড়ি—উমেশচন্দ্র গুপ্ত।

কলাসৃষ্টি ব্যর্থ বলতে হবে। কিন্তু তাই যদি বলি, তবে এই কথাই বলতে হয় যে, শিল্পকলার মূল্যবিচারে আমার রসজ্ঞানই একমাত্র মাপকাঠি। সেক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়ের সম্যক্ রসজ্ঞান আমার আছে কি না সেটাও বিচার্য। যে-কোন শিল্পকলার মূল্য-নিরূপণে তার উপকরণ, বিষয়-বস্তু ও টেকনিক—এই তিন দিক থেকেই তার বিচার করতে হয়। চিত্রকলার উপকরণ হচ্ছে—রূপ, রেখা ও রঙ্। এগুলি আমরা পাই প্রকৃতির কাছ থেকে—তাই এগুলি শাশ্বত। যে-কোন দেশের যে-কোন কালের আর্টিষ্টকেই এগুলি ব্যবহার করতে হয়। তাই এগুলি সম্বন্ধে যাঁর রসজ্ঞান আছে, অর্থাৎ কি গুণ থাকলে এগুলি রসোত্তীর্ণ হয় তা যাঁর জানা আছে, তিনি যে-কোন দেশের ও যে-কোন কালের কলাসৃষ্টির রস গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই পারবেন। এই দিক থেকে রবীন্দ্র-চিত্রকলার রসগ্রহণ করতে না পারার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

তারপরে, বিষয়বস্তু ও টেকনিকের দিক থেকে শিল্প-কলার বিচার করতে হলে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। যিনি কলাসৃষ্টির রসগ্রহণ করতে চান, স্রষ্টার রুচির সঙ্গে তাঁর রুচির মিল থাকা চাই—অন্ততপক্ষে স্রষ্টার রুচিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার ঔদার্য থাকা চাই। নইলে উঁচু দরের সৃষ্টি হলেও তার রসগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আসল কথা হচ্ছে শিল্পকলার বিচারে আমাদের দেখতে হবে, আর্টিষ্টের মনের রসানুভূতি তাঁর কলাসৃষ্টিতে সম্যক্ রূপলাভ করেছে কি না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ॥ অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশে নব্যবিজ্ঞানের চর্চা বড় বেশীদিনের নয়। এদেশে বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের জীন্‌স্ বা হাক্সলির মতই বিজ্ঞানের দুরধিগম্য কঠিন বিষয়বস্তুকে সুবোধ্য, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার শুরু অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠে'র মধ্য দিয়ে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে বাংলাসাহিত্যের এক নতুন ধারা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'গগন পর্যটন', বিপিনচন্দ্র লিখলেন 'প্রাণের কথা', রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বিশ্ব-পরিচয়'; কিন্তু আরও উৎকৃষ্ট ফললাভ হল জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখায়। এঁদের

প্রত্যেকেই যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বকে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায়, কোথাও কোথাও হাস্যরস মিশিয়ে, ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি অনুরাগ বাড়িয়ে তোলাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টায় এঁরা প্রত্যেকেই সফল হয়েছেন। তবে এঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের লেখায় একটু নিজস্বতা আছে, তাঁর লেখার স্বল্পতার দরুণ সাধারণ বাঙালীর কাছে তাঁর এই বিশেষত্বটুকু অপরিচিত। বহুমুখী প্রতিভা আশীর্বাদও বটে, অভিশাপও বটে। জওহরলাল নেহরু, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, চার্চিল প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের প্রতিভার আলোয় কোন বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেইজন্যেই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের যে পরিচয় তা হারিয়ে গেছে বা কিছুটা নষ্ট হয়েছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একজন ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সাহিত্যশিল্পী বা সাহিত্যপ্রেমিক হিসাবে তাঁর পরিচয় দেশবাসীর কাছে নেই বললেই চলে। বাংলায় লেখা তাঁর একটিমাত্র বই—'অব্যক্ত'। কিন্তু এই একটিমাত্র বইয়ে তাঁর যে সাহিত্যিক পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা কখনো ভোলবার নয়। তাঁর সরল ভাষা, ক্ষণিক হাস্যরসের অবতারণা, অতিপরিচিত দ্রব্যের সঙ্গে উপমা প্রদান প্রবণতা একদিকে যেমন তাঁর লেখনীশক্তির পরিচয় দিচ্ছে অপরদিকে বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের উপলব্ধি তাঁকে একজন সার্থক শিল্পী করে তুলেছে। গবেষণা ছিল তাঁর বহিরঙ্গের ধর্ম, ভাবুকতা ছিল তাঁর অন্তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। আর এর ফলে জগদীশচন্দ্রের লেখা অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ বা প্রবল উচ্ছ্বাসময় হয়ে উঠেনি। তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু ভাবুকতা, কবিত্ব ও কল্পনার সুষ্ঠু সমন্বয়ে এক সত্যকার রসমণ্ডিত সাহিত্য হয়ে উঠেছে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহে সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ।

জগদীশচন্দ্র সহজ সরল ভাষায় শিশুদের মনের মত করে 'গাছের কথা' শুনিয়েছেন। স্বচ্ছন্দগতি ও রসসৌন্দর্যে মণ্ডিত এই প্রবন্ধে গাছের বীজের বায়ুভরে স্থানান্তরে পতনের পর অঙ্কুরোদ্গমন বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন :

"মনে কর একটি বীজ সমস্ত দিনরাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট বা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল, এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষশিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে বৃক্ষশিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।"

এর পর তিনি আরও অনবদ্য সুন্দর ভাষায় গাছের পরাগমিলন বর্ণনা করেছেন:

"ফুল ফুটিলে গাছও তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া আনে। গাছ ডাকিয়া বলে, 'কোথায় আমার বন্ধুবান্ধব, আজ আমার বাড়ীতে এস, যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ী যদি চিনিতে না পার, এজন্যে নানা রঙের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙীন পাপ্‌ড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।' মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকালের বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে গাছের ফুল দেখিতে আসে। কোন কোন পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখীর ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখী তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে, রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল সন্ধ্যা হইতেই চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।"

এই লেখা যে পড়বে সে-ই মুগ্ধ হবে। শক্ত কথা, কঠিন বিশেষণ, বাক্যের জটিলতা কিছুই এতে নেই। এই যে জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশী অনুভব করি, তা হচ্ছে একজন হৃদয়বান লেখকের অপূর্ব লিখনভঙ্গী।

তাঁর লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য—লেখার মাঝে রসিকতার অবতারণা করে সমগ্র পরিবেশটাকে হাল্কা করে তোলা, আর বিজ্ঞানের কঠিন বিষয় পাঠে ভারাক্রান্ত পাঠকমনকে সরসতার রঙে রাঙিয়ে দেওয়া। তারই প্রমাণ তাঁর 'অদৃশ্য আলোক' প্রবন্ধটি। তিনি সার্থক সাহিত্যিকের মত গল্প বলতে পারতেন, তার উদাহরণ 'অগ্নিপরীক্ষা'। এখানে তিনি 'নেপাল যুদ্ধ' বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবতঃ "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধে তিনি সুনিপুণ শিল্পীর মত ভাবে ও ভাষায়, সত্যে ও কল্পনায়, রসে ও রূপে বৈজ্ঞানিক সত্যের একটি সালঙ্কারা কাব্যমূর্তি সৃষ্টি করেছেন। এই রচনাটি ভৌগোলিক উপাদান ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্ভার বহন করেও তাঁর সাহিত্যকর্মের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন হয়ে রয়েছে। তত্ত্বকে চিত্রে রূপায়িত করা, বাস্তবকে কল্পনার রঙে রঙীন করে মানসপটে আঁকা শিল্পীর কাজ। আর যে শিল্পী যত নিখুঁতভাবে তা পারেন, তিনি তত সার্থক শিল্পী। এ প্রবন্ধ পড়ে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় জগদীশচন্দ্র একজন সার্থক সাহিত্যশিল্পী।

জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয় ইং ১৮৫৮ সালে। প্রথম বয়সে বিশেষ কিছু লেখেননি। ১৮৯৪ সালে 'আকাশস্পন্দন' ও 'গাছের কথা' লেখার পর থেকেই প্রধানতঃ তাঁর বাংলা লেখার সূত্রপাত। তিনি বহুকাল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই পরিষদের কর্ণধাররূপে সাহিত্যপ্রেমিক জগদীশচন্দ্র বলেছেন: "আমাদের পরিষদ কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থপ্রকাশ লইয়া থাকিতে পারে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র

করিয়া জীবন্ত সাহিত্যে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।" সাহিত্যিকগণের নিজেদের দলাদলি এই সত্যকার সাহিত্যসেবীকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন: "যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকশিত হয়, তাহা কি এইরূপে পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?" জগদীশচন্দ্র এই 'চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাস'কে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন, কেননা সাহিত্যসাধনাকে তিনি আন্তরিক ভালবাসতেন।

সার্থক গদ্যের যে দুটি প্রধান গুণ—শ্লেষগুণ ও প্রসাদগুণ, তা জগদীশচন্দ্রের রচনায় বর্তমান। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ভাষার সারল্য, যুক্তির শৃঙ্খলা, ও সংযমের অক্ষুণ্ণতা। জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনাতেই প্রথম বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলন ঘটেছে এবং এই দুয়ের মিলনে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসাহিত্যের যে ধারার উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়, তা আজও বাংলা সাহিত্যে প্রবহমান।

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাকে আমরা একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা-রূপে সম্মান করেছি বটে, কিন্তু একজন সত্যকার কবিদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের প্রতিভা-রূপে আদর করিনি। তাঁর রচনাসংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বাংলায় একমাত্র বই —'অব্যক্ত'। কিন্তু ওই সামান্য কয়েকটি লেখাই, বিশেষতঃ 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র মত লেখা আপন বিশিষ্টতায় বাংলা সাহিত্যে চিরভাস্বর। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে তাঁর মধ্যে যে অজস্র সম্ভাবনা দেখা গেছে, তা-ই তাঁর সাহিত্য-কৃতির জয়পতাকা। এই সম্ভাবনার আলোকে জগদীশ-প্রতিভার এই দিক সমুজ্জ্বল। তাঁর এই অপরিসীম সাহিত্যিক সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পেলাম না, এই আমাদের দুর্ভাগ্য।

আগামী ৩০শে নভেম্বর (১৯৫৮) আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী। দেশ জুড়ে এই পুণ্যতিথি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই স্মরণ-তিথিতে যেন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে স্মরণ করা না হয়, শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর দানের মূল্যায়ন করা না হয়। এই মনীষীর পুণ্য জন্মক্ষণে সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্রকেও যেন আমরা সেই সঙ্গে স্মরণ করি, ভারতবর্ষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনায় অন্যতম সাধক জগদীশচন্দ্রকে যেন আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি। তবেই হবে সত্যকার জন্মোৎসব পালন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন: "আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।"

বিদ্রোহী নজরুল ॥ সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের একজন স্মরণীয় কবি। তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর অপূর্ব প্রাণাবেগ। সমসাময়িক কালে কবি হিসাবে তিনিই গণচিত্তকে সর্বাপেক্ষা বেশী আলোড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে নজরুলের ঐতিহাসিক মর্যাদা অসাধারণ।

নজরুলের কাব্যে দেশপ্রেমের একটা অপূর্ব উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে। দেশাত্ম-বোধক কবিতাগুলির জন্যই তাঁর খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশী। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভগবানের নির্দেশ—তাই কবি মরণকে তুচ্ছ করে, ভীতি, দ্বিধা, অবিশ্বাসকে দূরে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। দুর্দিনের ঘোর রজনীতে স্বাধীনতার দুর্গম পথে যারা তীর্থযাত্রা করবে তাদের সাবধান-বাণী শুনিয়েছেন :

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

তাঁর এই আহ্বান প্রতিটি দেশপ্রেমমূলক কবিতাতেই অনুরণিত। অতিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতাতেই নজরুল প্রথম নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে" বা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতো নজরুলের 'বিদ্রোহী'তেও জীবনে হঠাৎ কোনো বৃহৎ চেতনার আবির্ভাবের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত। এর পর হতেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় এক অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়। তিনি নিজেকে দুঃস্থ মানবতার মুক্তির বাণী প্রচারকদের অন্যতম প্রধান অগ্রণী জ্ঞান করেন।

'বিদ্রোহী' এবং তৎপরবর্তী বিদ্রোহমূলক কবিতাগুলির ভিত্তিতে অনেকে নজরুলকে সাম্যবাদী কবি বলে মনে করেন। নিঃসন্দেহে 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে এক ভীষণ-মনোহর জীবনের আভাস পাই। এই যুগের প্রায় সব কবিতাতেই সাম্যবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে; কবি রাশিয়ার সাম্যবাদের প্রতিও বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু এটাও সত্যি যে নজরুল কখনোই পুরোপুরি সাম্যবাদী হননি। কারণ, এই সাম্যবাদের যুগেও তিনি 'প্যান্ ইস্‌লামী' ভাবের যথেষ্ট কবিতা লিখেছিলেন এবং 'চপল মেয়ের কাঁকন চুড়ির কনকনে'র ছলনায় মুগ্ধও হয়েছিলেন। নিবিড় সমবেদনা ও তীব্র মানবিকতা তাঁর চঞ্চল প্রকৃতিতে সাম্যবাদের একটা ছায়ামাত্র এঁকে, বঞ্চিত মানবতার জন্য গভীর দরদ ঘনীভূত করেছিল।

সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন—কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর শুধুই অভিমান, আর কিছুই নয়।

বিদ্রোহী মনোভাবের অন্তরালে তাঁর অন্তঃস্থিত চেতনাটি ছিল রোমান্টিক। তাঁর এই রোমান্টিক চেতনায় স্বাধীনতার কোন স্পষ্ট রূপ নাই। শুধু ঐকান্তিক কামনাটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। নজরুলের বিদ্রোহী ভাবনা স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদের পথটির প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়েছে। এতে যুক্তি-চিন্তার অবকাশ নাই—সংগ্রামের উদ্দীপনাই বেশী। এজন্য গান্ধীজির সত্যাগ্রহকেও তিনি বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি।—'গান্ধী হউক বন্দী মোদের, সত্য বন্দী নয়।'—কিন্তু লক্ষণীয় এই যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের গুরুত্ব কিন্তু তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ প্রত্যক্ষ করে তাঁর অন্তর বেদনা ও ক্ষোভে ভরে উঠেছে।

নজরুল কিন্তু বায়রনের মত রাজনৈতিক মুক্তিলাভকেই স্বাধীনতার চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করেননি। সমাজজীবনেও তিনি বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। কল্লোল যুগের হয়েও নজরুল কল্লোলীয়দের মতো স্বাধীনতাকে অসম্ভব ব্যাপার বলে উপেক্ষা করেননি। স্বাধীনতার আকাশকুসুমও নজরুল চয়ন করতে যান। নজরুলের পৌরুষদৃপ্ত চেতনা স্বাধীনতার বাস্তব সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাসী ছিল। তিনি দেশবাসীকে সমস্ত বিভেদের মধ্যেও দৃঢ় একটি কর্মপন্থায় আহ্বান জানিয়েছেন—এইখানেই তিনি বায়রনের সমধর্মীয়। বায়রনের মতোই তাঁর কাব্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, রূপকল্প ও সঙ্গীতময়তার অভাব রয়েছে। এই দুই কবির মধ্যেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব বীর্য ও পৌরুষের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু বায়রনের আর একটি গুণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাজ বিশ্লেষণ—তাঁর নাই। উপরন্তু সত্যেন দত্তের কবিতাতে যে পরিহাসের চমক দেখা যায়—নজরুলের মধ্যে তারও অভাব রয়েছে। নজরুলের মধ্যে 'অহং' বোধের প্রাবল্য এতই বেশী যে এতে তাঁর বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও বিদ্রূপ করবার রসিক চেতনা—দুই-ই চাপা পড়ে গিয়েছে। তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় সমাজের অন্যায়, অবিচার দর্শনে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধলিপ্সু হয়ে উঠেছে,—এবং এই প্রতিশোধ-স্পৃহা এতই প্রবল যে তিনি আদিম বর্বরতাকেও পুরোপুরি ত্যাগ করে উঠতে পারেননি। এর ফলে কিন্তু তাঁর কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই সরল কাঠিন্য লাভ করেছে।

নজরুলের কাব্য প্রধানতই উদ্দীপনাসর্বস্ব বলে, তাঁর কাব্যে ভাবের মধ্যে সুসংবদ্ধতার বড় বেশী অভাব রয়েছে। বিদ্রোহের কোনো স্পষ্ট রূপ তাঁর ধারণায় নাই—তার প্রকৃতিও তিনি কল্পনা করতে পারেন না। এই বিদ্রোহের চেতনা

একটা অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন নামগোত্রহীন ভাবাত্মক বস্তু, কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ এতে নাই। তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে যতটা তীক্ষ্ণতা থাকুক না কেন তা ততটা দৃঢ়সম্বদ্ধ নয়। কিন্তু নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে—তিনি শুধু স্বাধীনতার জন্যই বিদ্রোহী নন, জরাজীর্ণ সমাজের অনুশাসনের বিরুদ্ধেও তাঁর চেতনা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এই দিক দিয়ে নজরুল চেয়েছিলেন একটি সর্বাত্মক বিপ্লব।

আরো একটি কারণে নজরুলের কবিতা মহান সাহিত্যসৃষ্টি রূপে পরিগণিত হবে। তিনি হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর কাব্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। উভয় ঐতিহ্যের মধ্যে যে সব জিনিস তাঁর কবি-মানসকে প্রভাবান্বিত করেছে তাকেই তিনি নির্বিচারে কাব্যে গ্রহণ করেছেন। এই মিলিত ঐতিহ্য তাঁর শিল্পচেতনাকে প্রভাবান্বিত করেছিল বলেই দেশাত্মবোধক কবিতাগুলিতে কবির ঐক্যের জন্য আবেদন আন্তরিকতায় ধন্য। প্রথম আবির্ভাবেই নজরুল জাতি-নির্বিশেষে জনসাধারণের সম্ভ্রম ও সমাদর লাভ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক কবিতা পূর্বসূরীদের কবিতা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎসাহ-সঞ্চারী, প্রাণধর্মী, উগ্র। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশমাতাকে দেবী বলে শুধু শ্রদ্ধাই জানিয়েছেন—নজরুল সেই দেবীর মুক্তির জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। দুজনেরই রচনা হৃদয়ের আবেদনে ধন্য—কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায় নজরুলের উপর রবীন্দ্রনাথ বা সমসাময়িক অন্যান্য কবির প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ বলা চলে। নজরুল সাহিত্যের এই দিকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

বিদ্রোহী কবিরূপে নজরুলের এই অভূতপূর্ব খ্যাতির পশ্চাতে রয়েছে তাঁর যুগ-চেতনা। তাঁর কবিতা যুগধর্মকে উৎসাহিত করেছিল বলেই সাধারণের হৃদয়ে তিনি এত সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। বিপ্লবে বিশ্বাসী বাংলার যুবশক্তি তখন তাঁরই মতো একজন কবির প্রত্যাশায় ছিল। মুকুন্দদাস এই প্রত্যাশার সবটা মেটাতে পারেন নি। নজরুল ইসলাম যুগের এই দাবীকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় যুগের প্রত্যাশাকে শেষ পর্যন্ত সফলতা দিয়ে গিয়েছেন। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন তিনি জনসাধারণকে, তাই চারণকবির মর্যাদায় অবিমিশ্র অভিনন্দন লাভ করলেন নজরুল।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' এবং দেশাত্মবোধক অন্যান্য কবিতা অবলম্বনে অনেকে তাঁকে যুগ-প্রবর্তক কবি হিসাবে প্রতিপাদন করেন। তাঁদের মতে নজরুলের এই ওজস্বিতা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। "বাংলার দার্শনিক আবহাওয়ায় এ চিন্তালেশহীন

ভাস্বর-ললাট চির-তারুণ্য, এই দ্বিধাহীন দুর্মদ তারুণ্যই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের চিরগৌরবময় দান।" কিন্তু এই অভিমতটি গ্রহণের পূর্বে একটি লেখা বিবেচনা করবার প্রয়োজন।

নজরুল প্রতিভার বিকাশ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের যুগে।

"আমরা চলি সমুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে,
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

অথবা

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

ইত্যাদি ছত্র বাংলার শিক্ষিত তরুণসমাজকে নজরুলের পূর্বেই যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া নজরুল যে তারুণ্যের রূপ দিয়েছেন, তার সাহিত্যিক মর্যাদাও অস্বীকার্য। তাঁর বিদ্রোহী যুগের কবিতা অনবদ্য নয়। পূর্ণাঙ্গ কবি-কল্পনা প্রকাশের অভাবও নজরুলের মধ্যে প্রায় বেদনাদায়ক। তাঁর কবিতায় উৎকৃষ্ট চরণের অভাব নেই, কিন্তু বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশে ও যৌক্তিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে দুর্মদ প্রাণশক্তির প্রাবল্য অভিব্যক্ত হয়েছে বলে তাঁর কবিতা আমাদের আদরের সামগ্রী। আমাদের সাহিত্যে এক ভয়ভাবনাহীন তারুণ্যের জয়গান তিনি গেয়েছেন। নব-জীবনের তোরণদ্বারে তাঁরই উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।
উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

নজরুলের এই বিদ্রোহী কবিতাগুলিতে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও, ত্রুটিও যথেষ্ট রয়েছে। এর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে। নজরুলের মনে যুগের সমস্যা ও বেদনা উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল—তিনি যুগমানব, সেইজন্যই কবির কল্পনা-লোকে অবস্থান তাঁর সম্ভব হয় নি। অবশ্য কবির কাব্য শুধু কল্পলোকের আকাশ-কুসুম চয়ন নয়; কবির কাব্য-ফুল ধরণীর ধূলিতেই প্রস্ফুটিত। যুগধর্মের বেদনায় কবিমানস লালিত ও গঠিত, কিন্তু গাছ আর ফুল যেমন এক নয়—সেই যুগের কাব্য ও সেই যুগের জীবনও এক নয়। তাঁর কাব্যে যুগের চেয়ে আপাতসমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে নজরুল বিশ্লেষণপন্থী নন, তাই তিনি কোন সমস্যারই ভালো সমাধান দিতে পারেননি। তবে সমস্ত অকৃতকার্যতার মধ্যে তিনি সহজ কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারলেন জীবন তাঁর কাছে মধুময়। তাঁর বাণীর ত্রুটি যতই চোখে পড়ুক, তাঁর সুগভীর জীবনবোধও দৃষ্টি এড়ায় না। নজরুলের বিখ্যাত কবিতাসমষ্টি "সাম্যবাদী" সম্বন্ধে একথা বেশী প্রযোজ্য।

নিজের সৃষ্টিকে পরিমার্জিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল না বলে, তাঁর কাব্যে স্থানে স্থানে ভাষায় বন্ধুরতা ও রূপকল্পের স্থূলতায় আমরা ক্ষুব্ধ হই। তথাপি একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে হবে যে প্রাণশক্তির প্রবল দ্যোতনায় বাংলা কাব্য ও সাহিত্যকে তিনি ঐশ্বর্যশালী করেছেন। এই মহিমময় অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুদূর সমুদ্রগর্জনের মত ভৈরবের মহা-সঙ্গীতের সুর যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। একদিন যে ভগীরথ প্রবল প্রাণের জাহ্নবীধারায় অভিষিক্ত করে এই মৃতপ্রায় জাতিকে সঞ্জীবিত করবেন, নজরুল যেন তারই অগ্রদূত। তাঁর কবিতায় আমরা বিস্মিত হয়ে শুনি সেই ভগীরথের আগমনী গান :

ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে মৃত্যুভীষণ কল্লোলে।

পিণ্টু-রীতুর গল্প ॥ অসীম সেনগুপ্ত

॥ এক ॥

পিণ্টু নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবতে পারত, তাবলে এমনতর কথা? কখনোই না। পেয়ারাটায় আর কামড় দেওয়া হলো না। পিণ্টু অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল।

—রাগ করলে বুঝি। মেয়েটা হাসল।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে পিণ্টু। তবু উত্তর দিল না।

—আহা, রাগ করার মত কি বলেছি আমি। মেয়েটার গলায় মনিষ্ট সুর। বলেছি তুমি ভীষণ লাজুক। এতে রাগ করার কি হলো।

—তুমি আমায় লজ্জাবতী লতা বললে যে।

—ভারি মজা তো! তুমি জবাব দিলে না বলেই তো আমি বললাম।

সত্যিই তো! পিণ্টু আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল। ওর দুই চোখে কেমন একটা আহ্লাদী হাসি। দেখলে ভাল লাগে। ভাব করতে ইচ্ছে করে।

—তুমি আমায় খোকা বলে ডাকলে কেন? হঠাৎ ফস্ করে বলে ফেলল পিণ্টু।

—ও তাই বল! মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসির তালে গা দুলছে। মাথার চুল দুলছে। ইস্ কি ভুল হয়ে গেছে, ভদ্রলোক বলা উচিৎ ছিল। কিংবা মশাই।

—অকাল পক্ক মেয়ে। পিণ্টু মুখ ঘুরিয়ে বলল। বলে দাঁত দিয়ে ডান হাতের নখ খুঁটতে লাগল। যেন ওর সামনে কেউ নেই।

মস্তবড় একটা পুরানো বাড়ির তিন তলায় মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাট। মুখোমুখি দুটো জানলা। জানলা দুটো হা করে খোলা।

সময়টা দুপুর। চারদিকে একটা নির্জন নিস্তব্ধ ভাব। বাতাসে পুরানো বাড়ির গন্ধ আর নিচের উঠোন থেকে ভেসে-আসা নিমপাতার সর্সর্ শব্দ। এখানে ওখানে,

কার্নিসে, ঘুলঘুলির ফাঁকে দুচারটে চড়ুই, দুচারটে পায়রা। মাঝে মাঝে কিচকিচ, বক্ বকম ডাক। এতে দুপুরের নির্জনতাটা ভাঙে না; ঘন হয়ে ওঠে আরো।

ঘরে ঘরে ঘুমিয়ে আছে সবাই। গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে, মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মা ঘুমিয়েছে, মাসী ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়েছে পিসী, খুড়ী, বাড়ির উড়ে ঠাকুর, আর দজ্জাল ঝিএরা। দুধের মত সাদা বেড়ালটাও মাছের কাঁটা চিবুতে চিবুতে সিঁড়ির তলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে। শুধু মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে ভেসে আসে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। পুরানো বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে, ভাঙাচোরা দেয়াল বেয়ে, ফেরিওয়ালার ডাক।

—এ্যাই শোন, এ্যাই, ইয়ে—মেয়েটা ডাকল।

পিণ্টু ভেবেছিল ওর কথায় কান দেবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে তাকাতেই হলো।

মেয়েটা বলল—আমি তোমার সাথে নিজে থেকে ভাব করতে এলাম, আর—তুমি আমার উপর রাগ করে কথাই বলছ না।

—না, না, রাগ করব কেন! ও এমনিই বলছিলাম। বেশ ভারিক্কী চালে বলল পিণ্টু। তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলল।

—হাসছ যে। মেয়েটা বলল।

—তোমার চুল বাঁধা দেখে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পিণ্টু বলে দিল।

—কেন কি হয়েছে!

—ঠিক যেন ঘোড়ার লেজ, হি হি হি।

—এসব মেয়েলী ব্যাপার তুমি বুঝবে না খোকা। গম্ভীর চালে টপ্ করে বলল মেয়েটা। পিণ্টু কিন্তু এবারে রাগ করল না। তেমনি হাসতে লাগল।

—খুব হাসি, আচ্ছা আমিও বলতে জানি, তোমার মাথার চুলটা ঠিক যেন—ঠিক যেন, মানে ঠিক ইয়ের মত—

—হ্যাঁ, ঠিক ইয়ের মত।

একসঙ্গে হেসে উঠল দুজন। এ জানলায় পিণ্টু, ও জানলায় মেয়েটা। মাঝখানে দুপুরের ঘুমন্ত বারান্দা। ছায়া ছায়া অন্ধকার।

এমনি করে ভাব হয়ে গেল দুজনের।

॥ দুই ॥

বাড়িটা অনেক দিনের পুরানো। আলো আসে কম। এ বাড়িতে ঢুকলেই মনে হয় সময়টা যেন দু' শতাব্দী পিছিয়ে এল। এর ভাঙাচোরা দেয়াল, ঝুপঝুপে

অন্ধকার বারান্দা সিঁড়ি, সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ; তার উপর একটা চাপা রহস্যময় আবহাওয়ার ফলে একথা মনে না হয়ে পারে না।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে গভীর রাত্রে আর গভীর দুপুরে। মনে হয় এই এত বড় বাড়িটা যেন ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে এক শব্দহীন নিতল কলরোলের মধ্যে। যে বস্তু যত নিঃশব্দ তার কলরোল ততই প্রবল বলে, ঠিক সেই সময় আশ্চর্য এক রহস্যে বাড়িটা ভরে উঠতে থাকে। জেগে থাকলে ভারি ভাল লাগে তখন পিন্টুর। নিজেকে তখন নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুশোর মতই একা মনে হয় তার।

আসলে এ বাড়িটা পিন্টুর কাছে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় একটা কিছু। যেন একটা রাজত্ব। বলা বাহুল্য সে তার সম্রাট। আবছায়া দেয়াল; ঘুণ ধরা দরজা জানলা, আলোহীন সিঁড়ি, নির্জন ছাত, আর এরই পর্বে পর্বে লুকানো রহস্য, এই হলো তার সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি।

এ বাড়ির ছাতে উঠলে রেল লাইন দেখা যায়। লেকের জল দেখা যায়। উঁচু রেল লাইনের ওপারে চিকন সবুজ ঘাস আর ছোট ছোট ঘাসফুল পর্যন্ত দেখা যায়। বছরের বারোটা মাস কেমন আশ্চর্য সুন্দর ভাবে এখান থেকে চোখে পড়ে। পিন্টু অবাক হয়ে দেখে।

বাড়িটা বড়। লোকজন সেই তুলনায় খুব কম হলেও, একেবারে বিরল নয়। তবে পিন্টু নিতান্তই একা। সমবয়সী সঙ্গী কেউ নেই। নিজের সঙ্গে কথা বলে, এবং নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেই ওকে সারাটা দিন কাটাতে হয়।

বাড়িতে ওরা তিনটি মানুষ। বাবা, মা আর সে। বাবা সকাল আটটায় বেরিয়ে যান। অফিস আর ছেলে পড়ান সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়। তখন তাঁর ক্লান্ত দেহ; খিটখিটে মন। কাজেই সাহস করে এগোনো যায় না। কথা বলা তো দূরের কথা। আর মা? তিনি অবশ্য বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গল্প করা? থাক সে কথা।

কাজেই ঠিক উল্টোদিকের ঘরে সমবয়সী একটি মেয়েকে আসতে দেখে পিন্টু ভীষণ খুশি হল। এক নজরেই মেয়েটাকে ভাল লেগে গেল ওর।

॥ তিন ॥

পিন্টু বলল—তোমার নাম বললে না তো! কি নাম তোমার।

—আমার নাম রীতু গুপ্ত।

—রীতু? ভারি অদ্ভুত নাম তো। কি রীতু? বর্ষা নিশ্চয়।

—হি হি হি।

—কি হলো হাসছ যে! হাসার কি আছে এতে। পিণ্টুর রাগ হয়।

—সেই ঋতু না। এ হলো 'র' এ দীর্ঘ ই, 'ত' এ হ্রস্ব উ। তুমি কিস্সু জাননা। বলেই রীতু আবার হাসতে শুরু করল।

—তা বলে হাসতে হবে! পিণ্টু ভেংচি কাটে। তোমার নামের বানান আমি জানব কি করে, শুনি!

—ওমা, তাহলে লেখাপড়া শিখছ কেন?

এর সঙ্গে লেখাপড়া শেখার কি সম্পর্ক পিণ্টু খুঁজে পেল না। চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—আচ্ছা অত তো ডাঁট মারছ আমার নামের বানান কর তো।

মুন দিয়ে আমড়া খাচ্ছিল রীতু। চোখ দুটো ছোট করে একটু হাসল।

—বল। রীতু বলল।

—আমার নাম, কার্ত্তবীর্যার্জুন গুচ্ছাইত; বানান করতো। নামটা পিণ্টু সেদিনের খবরের কাগজেই পেয়েছিল।

—মিথ্যে কথা। ওটা একটা নামই না। রীতু বলল।

—পারবে না, তাই বল।

—উহু। এমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলের অমন বিশ্রী নাম হয় না। রীতু হাসল।

—যাঃ। লজ্জা পেল পিণ্টু। আড়চোখে রীতুর দিকে চাইল। তোমার নামটা কিন্তু ভারি সুন্দর, পিণ্টু বলল, আমার নাম পুলক চৌধুরী। কেমন, ভাল?

—খুব ভাল।

—পেয়ারা খাবে? পিণ্টু বলল।

—আর আছে? ওটা তো এঁটো।

—আছে, এই নাও। পকেট থেকে একটা পেয়ারা বের করে পিণ্টু এ জানলা থেকে ও জানলায় ছুঁড়ে দিল।

—কিন্তু তোমাকে কি দেব। ওটা টপ করে লুফে নিয়ে রীতু বলল।

—কিচ্ছু না। পিণ্টু অকারণেই একটু হেসে নিল।

—আচ্ছা তুমি একটু দাঁড়াও। রীতু ভেতরের দিকে চলে গেল। তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফিরে এল। এই নাও লোফ। রীতু বলল।

এক, দুই, তিন, চার। রঙচঙে কাগজে মোড়া, চারটে টফি লুফল পিণ্টু। লুফে রীতুর দিকে তাকাল।

তখন কা কা করে ডাকতে ডাকতে একটা কাক এসে বসল তিনতলার কার্নিশের

ওপর। বাতাসে ছাতের দরজাটা নড়ে উঠল। আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে কথা কয়ে উঠল পিন্টুর মা।

চোখে চোখ রেখে ওরা হাসল। হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলল। আলগোছে দরজা খুলে চোরের মত বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে পিন্টু বলল—চুপ।

রীতু ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ জানি, আর বলতে হবে না।

॥ চার ॥

রীতুরা মাত্র একদিন হলো এখানে এসেছে। আর বলতে গেলে ঘর ছেড়ে এখনো পর্যন্ত ভাল করে বেরোয় নি। তবু এই নতুন জায়গায় এসে বেশ ভাল লাগল রীতুর। বাড়িটা ভাঙাচোরা বটে, তা হোক। কেমন সুন্দর একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঘুম ঘুম ভাব। সবচেয়ে বড় কথা ছাতে উঠলেই নাকি রেল লাইন দেখা যায়।

এর আগে ওরা যেখানে থাকত, সেটা একটা নরক। থাকার ঘরটা ছাড়া আর সব কিছুই বারোয়ারী। রাত,দন হৈ-হট্টগোল, ঝগড়াঝাঁটি, গালাগালি। সারা বাড়িটা দিনে রাতে কখনই শান্ত হতো না। এর ওপরে সব থেকে অসহ্য লাগত সকলের গায়ে পড়া ভাব। কাজেই এ একরকম ভালই হলো বলতে হবে।

এখানে কেমন শান্তি। তাদের ঘরে কেউ উঁকি দিতে আসবে না। গায়ে পড়ে কথা শোনাতে আসবে না। বেশ নিশ্চিন্তি। জলকল নিয়েও কোন রকম হাঙ্গামার সম্ভাবনা নেই। সব আলাদা আলাদা। পাড়াটাও ভদ্র। প্রতিবেশীরাও।

পিন্টুকে তো ভীষণ ভাল লেগে গেছে তার। ওর মন যেন ঠিক এমনি এক সাথীর জন্যই ভেতরে ভেতরে উন্মুখ হয়ে ছিল। এখন পেয়ে খুশি হলো। বেশ লাজুক লাজুক চেহারাটি। রেগে গেলে মজা লাগে দেখতে।

পিন্টুর চেয়ে রীতুর অভিজ্ঞতা বেশী। ছোটবেলা থেকেই বারোয়ারী আব-হাওয়ায় মানুষ হওয়ায় রীতু পিন্টুর চেয়ে অনেক বেশী দেখেছে, বেশী শুনেছে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতেও পারে।

॥ পাঁচ ॥

বারান্দায় বেরিয়ে পিন্টু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল—চুপ।

রীতু ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ, জানি, তোমাকে আর বলতে হবে না।

—চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। চাপা গলায় পিন্টু বলল।

—কোথায় ?

ই।

ভয় করছে, ভাই।

কিসের ?

য়। আর দেয়ালে ওসব কি আঁকা।

? ওহো, ওগুলো তো ভূতের ছবি ; সত্যিকারের ভূত তো নয়।

আছে।

াই ? পিন্টুর কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল রীতু।

র দেখা যায়। কত রকম চেহারা তাদের। ওই যে বেড়ালটা

াই একটা ভূত কিনা কে বলবে ?

তাড়াতাড়ি পিন্টুকে জড়িয়ে ধরল রীতু। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা

ওপর থেকে নীচে নেমে এল।

কী ভীতুরে বাবা।

অমন করে ভয় দেখাতে আছে। আমি তোমার সঙ্গে আর কথা

ঠোঁট উল্টাল।

রয়ে গেছে। আমি চললাম তুমি থাক পড়ে।

াবাঃ, তুমি ভীষণ অল্পতেই চটে যাও।

ালবং চটব। তুমি কোন ইস্কুলে পড় ?

দিয়ে কি হবে ? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল রীতু।

না একবার। কণ্ঠস্বরের কৌতুক চেপে পিন্টু বলল।

ভবন।

ইস্কুলের নাম কি রে বাবা, নিউ বিদ্যাভবন।

—হ্যাঁ, নিউ বিদ্যাভবন, তো কি হয়েছে, দাঁত একেবারে বেরিয়ে

বেরুবে না তো কি হবে ? ইস্কুল নয় তো যেন চায়ের

ার ইস্কুল চায়ের দোকানই হোক বা মুদীর দোকান হোক তাতে

—না, আমার আবার কি ; ওসব গাধার ইস্কুলে তো গাধারাই পড়বে। কোন ক্লাসে পড় !

—তুমি কোন ক্লাসে পড়, শুনি ?

—আমি ? ক্লাস সেভেনে পড়ি আমি। বুক ফুলিয়ে পিন্টু জবাব দিল।

—এতবড় ছেলে সেভেনে পড়।

—আর তুমি ? পিন্টু সোজাসুজি তাকাল।

—আমি ক্লাস এইটে পড়ি।

—ওই ইস্কুলের আবার এইট, হ্যাঃ। ওখানে তো মেয়েরা বিয়ের জন্য ভর্তি হয়। যতদিন না বিয়ে হয় ততদিন ক্লাস টেন। বিয়ে হয়ে গেলে অ, আ, ই ; হি হি হি।

—আজ্ঞে না স্যার, আমার মামা বলেছেন খুব ভাল ইস্কুল।

পিন্টু বলল—ভাল। আচ্ছা তোমাদের পাটীগণিত কদ্দূর হয়েছে, শুনি।

—ঐকিক নিয়ম হচ্ছে।

—মাত্র। আমরা টাইম এ্যাণ্ড ডিসট্যান্স করছি।

—কোন ইস্কুল তোমাদের ?

—সাউথ ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল।

—ধুঃ, ঐ ইস্কুল ! তোমাদের সেক্রেটারী হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কাগজে কি সব বেরিয়েছে, দেখেছ ?

—কি বেরিয়েছে ?

—ইস্কুলের টাকা মেরে লোকটা নাকি গাড়ী কিনেছে। কাগজে লিখেছে বাপের অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্র। অমন নাম করা বাপ। সেদিন মা বলছিলেন আমাকে।

—আর তোমাদের সেক্রেটারী বা কী ! একরত্তি মানুষ, চোখে দেখা যায় না, অথচ শয়তানিতে সেরা।

ঠিক এই সময় মিউ করে বেড়ালটা ডাকল। একতলার নিম গাছের ডালে শুকনো পাতার খস খস শব্দ উঠল। আর মাথার ওপর কড়িকাঠ থেকে একটা টিকটিকি টিক টিক করল।

এলোমেলো কয়েকটা শব্দে বারান্দার থমথমে ভাবটা আরো ঘন হয়ে উঠল।

চলতে চলতে একটু পরেই রীতু বলল—বাড়িটা কতদিনের, ভাই।

—অনেক, অনেকদিনের পুরানো বাড়ি এটা।

—একশ বছর আগেকার ?

—বোধহয়। বাড়িটা ছিল একজন খুনে জমিদারের। তখন এর চারপাশে গভীর বন ছিল। রাত্রে বাঘ ডাকত, শেয়াল ডাকত।

—বাঘ ডাকত ? সত্যি। আর কিছু ছিল না।

—থাকবে না কেন, হায়েনা ? বনের ভেতর থেকে ঠিক বাচ্চা ছেলের মত কাঁদত হায়েনা।

—সাপ ? বড় বড় চোখ তুলে রীতু তাকাল।

—সাপের কথা আর কি বলব ; বনে তো সাপ থাকবেই। পিন্টু হাই তুলল।

—এখানে সেই জমিদার থাকত কি করে ভাই।

—আরে সে তো খুনে জমিদার। ডাকাতের সর্দার। কত লোকের মাথা কাটা গেছে এ বাড়িতে। খুঁজলে এখনো রক্তের দাগ মেলে। আমি বাবার কাছে শুনেছি।

—কি সব্বোনাশ। রীতু ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাল।

হঠাৎ গলার স্বর খুব নামিয়ে আনল পিন্টু। ফিসফিস করে বলল,—কাউকে বলো না যেন, খবরদার, এই বাড়িরই কোথাও—

—কি থামলে যে, বল। রীতুর গায়ে কাঁটা দিল।

—কাউকে বলবে না তো।

—না।

—আমার গা ছুঁয়ে বল।

—না, বলব না।

—এই বাড়িরই কোথাও অনেক গুপ্তধন লুকানো আছে।

—কোথায় ?

—তা জানি না, তবে খুঁজছি। শিগগিরই পেয়ে যাব। তোমাকে বলে রাখি, এখন থেকে সব সময় মেঝে টুকে টুকে দেখবে। কোনখানে ফাঁপা আওয়াজ হলেই আমাকে খবর দেবে, বুঝলে !

—বুঝলাম। কিন্তু তুমি টাকাটা পেয়ে কি করবে বল তো। অত টাকা !

—কি আবার করব প্রথমে এই বাড়িটাই কিনে ফেলব। তারপর—

—তারপর কি ?

—তোমাদের সবাইকে এখান থেকে হটিয়ে দেব ; দিয়ে—

—আমাদেরও ?

—সওব। তারপর এখানে একটা দল গড়ব।

—কিসের দল ভাই ?

—ডাকাতের। ঘাড়টা ঈষৎ ওপরে তুলে পিন্টু নির্বিকার ভাবে বলল।

—ডাকাতি করবে তুমি ? ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাতি করে কখনো !

—আরে সেরকম ডাকাত নয়। এ হল ভদ্রলোক ডাকাত, রবিনহুডের মত। খারাপ লোকের টাকা নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। পাজী লোকদের মেরে তক্তা বানিয়ে দেব। প্রথমেই তোমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারী অই ক্ষীরোদ ব্যাটাকে ঠ্যাঙাব।

—তুমি এখানে দল গড়বে, তাহলেই হয়েছে আর কি। যা চেহারা।

—কেন আমার চেহারা কি খারাপ ?

—দেখতে তো ভালই, বেশ লালু লালু ; কিন্তু গায়ে কি আর জোর আছে ?

—জোর নেই ? লাগাও পাঞ্জা। পিণ্টু সজোরে রীতুর হাত দুটো চেপে ধরল।

—ছাড়, ছাড় লাগছে, আমার সঙ্গে কেন, আমি তো মেয়ে—

—তবে ! আমার সঙ্গে চালাকি, হুঁঃ, হাড় ভেঙে ছাতু করে দেব না।

ওপাশের একটা জানলা কোন হাওয়ায় যেন খুলে গেছে। এক ঝলক ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে ওদের গায়ের ওপর। এতে অন্ধকারটাও একটু পাতলা হয়েছে। সেই আবছা আলোয় পিণ্টু দেখল, রীতু একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই রীতু হাসল। বোকার মত পিণ্টুও হাসল। হঠাৎ এগিয়ে এসে রীতু পিণ্টুর একটা হাত জড়িয়ে ধরল। বলল—রাগ করলে ?

—কেন, রাগ করব কেন ?

—ঐ যে গায়ে জোর নেই বললাম বলে।

—ধ্যেৎ। পিণ্টু হাসল। তোমার হাতে লাগেনি তো।

—না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু চড়াইয়ের অশ্রান্ত কিচ্‌কিচ্। আর দেয়ালের গায়ে থরথর করে কাঁপতে থাকা ওদেরই বড় বড় দুটো ছায়া।

আর একটু এগিয়ে এসে পিণ্টু বলল—এই যে আমরা সিঁড়ির কাছে এসে গেছি। খুব আস্তে পা টিপে টিপে উঠতে হবে কিন্তু, কাঠের সিঁড়ি ভীষণ শব্দ হয়। রীতু অবাক হয়ে তাকাল। সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে! ওখানে যেতেই হবে।

অতি সন্তর্পনে প্রথম সিঁড়িটায় পা দিতেই সহসা রীতুর মনে হল সে যেন, গল্পে পড়া কোন এক রূপকথার রাজ্যে ঢুকতে যাচ্ছে।

পিণ্টু আগে আগে। কেননা সে রাজ্য আবিষ্কার এবং প্রবেশাধিকারের অহংকারটা তার একান্তই নিজস্ব।

পেছন ফিরে পিণ্টু বলল—কেমন লাগছে।

রীতু বলল—ভাল, খুব ভাল।

॥ ছয় ॥

ঐ যে দূরে নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিক করছে জল ; ঝিলমিল করছে কতগুলো রূপালী রেখা, ওটার নাম লেক। গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে সোনার রোদ। সেই রোদে গা এলিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে সবুজ কচি ঘাস আর ছোট ছোট অসংখ্য ঘাসের ফুল। একটা ছুটো গরু চরছে। গাছের ডালে ডাকছে একটা ছুটো পাখী। আর তেঁতুল গাছের ছায়ায় গামছা পেতে ঘুমিয়ে আছে একটা ছুটো লোক। মাঝে মাঝে উঁচু রেল লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে রেলগাড়ী। দূর থেকেও তার সিটি শোনা যায়। রেলগুলো কোথেকে আসে আর কোথায় যায়, কে জানে!

মাথার ওপর নীল, খুব নীল আকাশ। আর কালো ভীষণ কালো মেঘ। জোলো হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে গাছের পাতা উড়ছে আকাশে। আকাশটাকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে না কি! দূরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে থোকায় থোকায় ফুল ফুটে রয়েছে। লাল টুকটুকে ফুল। রেল লাইনটাকে মনে হচ্ছে পাহাড়।

অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না রীতু। পৃথিবীতে যে এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে ওর তো জানা ছিল না! এ যেন ঠিক বিলিতি ক্যালেণ্ডারের ছবি। গভীর বিস্ময়ে এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দে রীতু পিণ্টুর দিকে তাকাল।

পিণ্টুর চোখ ছুটো ছোট হয়ে এসেছে। চোখের সামনে বাড়ি ঘর ছাত গাছপালা ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টিটা যেন কতদূরে চলে গেছে। সমস্ত মুখটা যেন এক নিতল বেদনায় ভরে উঠেছে। মাথার চুল হাওয়ায় উড়ছে। চিবুকের তলে কয়েক ফোঁটা ঘাম। অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে উঠেছে চেহারাটা।

রীতু অবাক হলো। হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল ছেলেটা। রীতু জানে না, এখানে এলেই সব ছাপিয়ে একটি কথাই মনে পড়ে পিণ্টুর। গাছপালা ; আকাশ বাতাসের ভেতর থেকে একটি মুখই তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আর একটি মাত্র সুরই ওর বুকের খুব নিরালা স্থানটিতে এক নিবিড় বেদনায় গুনগুন করতে থাকে।

ছাতের এককোণে একটা ছোট্ট চিলেকোঠা। তারই ভেতর একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর রীতু আর পিণ্টু পা ছড়িয়ে বসেছিল। তখন মাথার ওপর আকাশে, বর্ষার মেঘ জমছিল ধীরে ধীরে।

অনেকক্ষণ পর পিণ্টু কথা বলল—এইটেই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। যখন মন ভাল লাগে না তখন চুপি চুপি এখানে চলে আসি আমি। চুপ করে বসে থাকি, যতক্ষণ না বিকেল হয়। এখানে এলে কিন্তু আমার কান্না পায় ভাই। ফিসফিস করে পিণ্টু বলল।

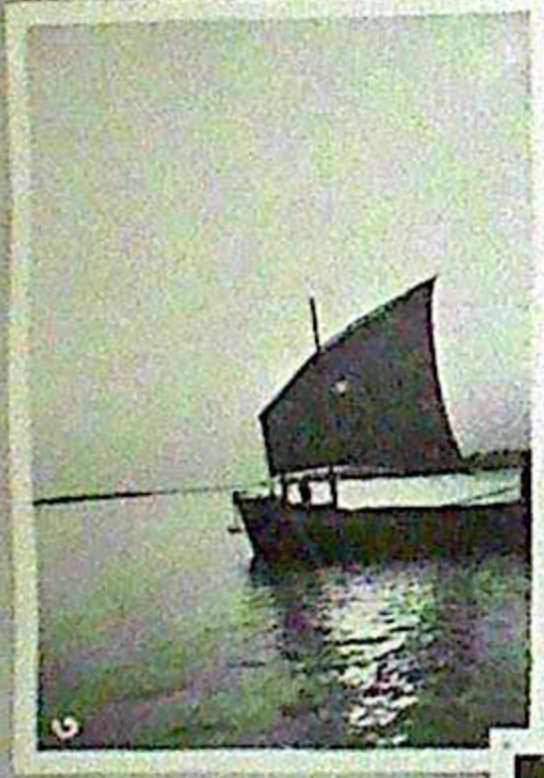

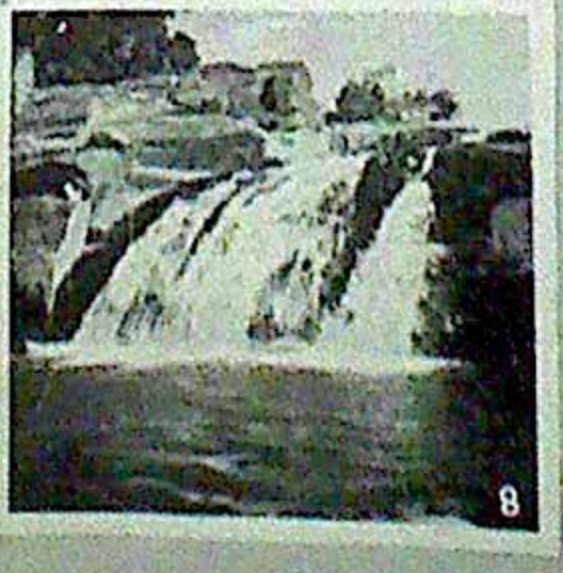

১ পাহাড়তলা—শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। ২ প্রহরী—প্রশান্ত রায়। ৩ আ জ কা র বঙ্গে—নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ৪ ঊর্মি—দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION

SESSION 1957-1958

Sitting from Left to Right : Pramatha Paul (Sports & Games Secy.), Asit Bhattacharya (General Secy.), Prof. Sisir Kr. Das (Retired President), Vice-Principal Nirode Kr. Bhattacharya, Principal Khagendra Nath Sen, Prof. Sankari Prosad Banerjee (President), Chittaranjan Bhattacharjee (Cultural Secy.), Kalyanasis Dasgupta (Vice-President), Brojananda Roy (Asst. Genl. Secy.).

Standing First Row from Left to Right : Prosanta Bishnu, Paresh Ghosh, Niren Sen Gupta (Canteen-in-charge), Pronab Roy, Dipti Prosad Banerjee (Jt. Cheap-Stores Secy.), Jahar Guha Neogy, Nirmal Roy (Asst. Magazine Editor), Ashoke Ghosh (Publicity Secy.), Satya Paul (Jt. Wall-paper Editor), Tapan Roy Chowdhury (Students' Aid-Fund Secy.), Tapan Basu Thakur (Commonroom Secy.), Dilip Bose (Asst. Sports & Games Secy.).

Standing Second Row from Left to Right : Ajoy Chatterjee (Office Secretary), Dipen Banerjee, Bhakti Nath Chatterjee, Subrata Banerjee (Jt. Cheap-stores Secy.), Ajoy Chatterjee, Nitendu Bose, Tapen Chatterjee, Hariranjan Ghosh, Sunit Mitra (Debating Secy.), Ajoy Gupta (Magazine Editor).

—কান্না পায়! কেন?

পিন্টু উত্তর দিল না। দূরে মেঘের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল ও। রীতু চেয়ে চেয়ে দেখল।

তারপর অনেকক্ষণ কাটল। সূর্যটা মেঘের আড়ালে পড়ায় চারদিকে একটা পাতলা ছায়া পড়েছে। ছায়ায় লুটোপুটি খেয়ে অনেক উঁচুতে সরু সরু একরাশ চিল উড়ছে। বেশ একটা গভীর মন্থর ভাব।

একটা ছোট হাই তুলে পিন্টু রীতুর দিকে তাকাল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে মেয়েটা। চোখ দুটো ব্যথায় ভরে উঠেছে।

তাহলে ওরও একটা দুঃখ আছে নাকি! কি আকাশ-পাতাল ভাবছে ওই জানে।

খুব আস্তে আস্তে পিন্টু ডাকল—রীতু, রীতু, এই রীতু।

—উঁ।

—কি ভাবছ।

—কিছু না। রীতুর চোখে লেকের রূপালী জল থরথর করে কাঁপছে।

মেঘে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে আসছে। এক দঙ্গল কাক কা কা করছে। দূরে রেলের সিটি।

—পিন্টু।

—অ্যাঁ।

—তুমি আমার ভাই হবে, আমার ভাই বোন কেউ নেই, আমি একা।

—আমিও একা। আমি তোমার ভাই হব। তুমি আমার বোন, কেমন? তোমার জামাটা কি সুন্দর রীতু। নিজের জামার ছেঁড়া অংশটা হাত দিয়ে আড়াল করে পিন্টু বলল।

—হ্যাঁ ভাই, জামাটা আমার মা বানিয়ে দিয়েছেন।

—তোমার মা বুঝি ভাই তোমাকে খুব ভালবাসেন!

—ভীষণ ভালবাসেন। আমার জন্য রোজ কত কিছু নিয়ে আসেন। রীতু বলল। আর তোমার মা?

—আমার মা! আমার মাও আমাকে খুব ভালবাসেন। বলতে বলতে পিন্টু জামাটা তুলে ঘুরে বসল। সারা পিঠে লাল লাল অসংখ্য দাগ। কতগুলো রক্তের সাপ যেন।

চমকে উঠল রীতু।—একি, এসব কি?

পিন্টু হাসল।—দুষ্টুমি করি বলে মা মারেন। দুষ্টুমি করলে তো মার খেতেই

হবে। পিণ্টু বলল। তবে আমার বাবা কিন্তু আমাকে মারেন না। তো
বাবাও নিশ্চয় তোমাকে বকেন না।

—আমার বাবা? স্থির চোখে রীতু পিণ্টুর দিকে তাকাল। জিব বের
নীচের ঠোঁটটা চাটল। একবার দূরে লেকের দিকে চাইল, তারপর নীচু গ
বলল—না, আমার বাবাও আমাকে কিছু বলেন না।

তখন শুরু হল ওদের সুখদুঃখের কথা। লেকের জল দেখতে দেখতে, কে
শব্দ শুনতে শুনতে দুজন দুজনের হাত ধরে অনেক গল্প করল ওরা। দুটি হৃদয়
কাছাকাছি এল। ওরা ভাই-বোন হলো। তবু পিণ্টু কিছুতেই রীতুকে ব
পারল না, ওর নিজের মা নেই, ওর পিঠে সৎমায়েরই লাঠির দাগ। পিণ্টু ভা
কি জানি, ওর মা নেই জেনে নিজের মায়ের কথা তুলে রীতু যদি ভাঁট মারে। ন
আলাপ তো!

আর রীতুও কিছুতেই পিণ্টুকে বলতে পারল না, ওদের ঘরে যে লোকটা
পিণ্টু দেখেছে সে রীতুর বাবা নয়, কেউ নয়। বলতে পারল না তার বাবা
অনেকদিন আগে ঐ লেকের জলেই ডুবে মরতে হয়েছে। রীতুও ভাবল, কি জা
ওর বাবা নেই জেনে নিজের বাবার কথা তুলে পিণ্টু যদি ভাঁট মারে।···ন
আলাপ তো!

কাজেই গল্প করতে করতেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। পাশাপাশি শুয়ে। ত
আকাশ জুড়ে অনেক মেঘ জমল। অনেক পাখী ডাকল আর অনেকবার সূ
মেঘের আড়ালে গেল।

পাথরের চোখ ॥ বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের রাত। আকাশের কালো মেঘ সকাল থেকে শুরু করে এখ
সমানভাবে গলে গলে পড়ছে সারা মফস্বল সহরটার গায়ের ওপরে। ত
মফস্বল সহর সোদপুরের অন্ধকারে যেন আজ একটু বেশী গভীরতা। কলক
থেকে নয়-দশ মাইল দূরের এই সহর। মিল-প্রধান। সিনেমা আছে, বাজ
আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে। মফস্বল সহর হলেও রাতে রাস্তায় বৈদ্যুতি
আলো জলে। সহরের সঙ্গে তফাৎ শুধু এখানকার বাসিন্দারা সহরের মানুষ
মত রাত বারোটায় শুতে যায় না। ন'টায় এখানে রাত নামে। তাই র

দশটার পর অন্ধকার বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে একা পথ চলতে অকারণ ভয়ে গা ছমছম্ করে।

আজও তাই। তবে অন্যদিনের মত আজ রাস্তায় একটি লোকও পথ চলছে না। বৃষ্টির একটানা ঝিরঝির শব্দ দরজায় খিলতোলা প্রতিটি ঘরের লোকের চোখে গাঢ় ঘুমের আমেজ ধরিয়েছে। শুধু রাস্তার বৈদ্যুতিক বাতি সোদপুর ওল্ড স্টেশন রোডের বৃষ্টিভেজা মাটির ওপর জেগে আছে। আর জেগে আছে ওল্ড স্টেশন রোডের সাদা দোতলা বাড়িটার ওপরের একটা ঘরের একটা টেবিল ল্যাম্পের আলো। এবং তার সামনে টেবিলের ওপরে স্তূপীকৃত কাগজের সামনে ঝুঁকে-পড়া একটি মানুষ। কলকাতার এক কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। অজয় সোম।

সকালে-বিকেলে পথ-চলতি লোক বাড়িটার দিকে না তাকিয়ে পারে না। দোতলার বারান্দায়, ছাদের কার্নিশে জানা-অজানা ফুলগাছের টব। মাঝে মাঝে ফুল চোখে পড়ে। রাস্তার সামনের গেট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত সরু লাল কাঁকর বিছানো পথ। দুপাশে সবুজ ঝোপ-ঝাড়। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষ ভাবে কি সুখী এই বাড়ির বাসিন্দারা। ঈর্ষা বোধ করে তারা। দিনের বেলা ভেতর থেকে রেডিওর গান ভেসে আসে রাস্তার লোকের কানে। রাতে কোন কোনদিন নাইট্ শো'য়ের সিনেমা-ফেরৎ লোকেরা শোনে এর দোতলা থেকে ভেসে-আসা একটা বেহালার করুণ সুর। শোনে সিনেমা-ফেরৎ কোন দম্পতি। মুগ্ধ হয়ে পুরুষটি বলে—"কি সুন্দর বাজনার হাত লোকটার। বেশ আছে, ছেলে-পিলে নেই। নির্ঝঞ্ঝাট সুখী জীবন……।" পুরুষটির মত অত মুগ্ধ নয়, স্ত্রী জবাব দেয়, "কিন্তু বড় অহংকারী দুজনেই। আজ পাঁচ বছর হলো পাড়ায় এসেছে—অথচ আলাপ-পরিচয় হলো না……।"

বাড়ির একটি মানুষ কিন্তু মনে মনে হাসে প্রতিবেশীর ভাবনার বহর দেখে। হাসে, কিন্তু একটা অসহ্য ব্যথাকেও সে গুটিয়ে রাখে। অধ্যাপকের স্ত্রী প্রতিমা প্রতিবেশীদের ধারণা বদলাতে চায় না। তাই রাগে, অভিমানে প্রতিবেশীদের মুখে মুখে বাড়িটাকে ঘিরে আলোচনা ঘোরে। নানা রকমের।—"কি হ্যাংলা মেয়েটা। সারাদিন রেডিও খুলে বসে সময় কাটায় বিকেলে স্বামীর আসার পথ চেয়ে! আর অত অহংকারীই বা কেন? ঐতো রূপ……!"

কিন্তু এটা শুধু মেয়েদের রাগের কথা। প্রতিমার দেহে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের অভাব নেই। ছোটবেলায় ঠাকুরমার নামকরণ যৌবনকালে সার্থক রূপ নিয়েছে। চোখে-মুখে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। খুঁত নেই মাথার চুলে, হাতে-পায়ের আঙুলে। কিন্তু তবু যেন শরীরে কিসের অভাব। সেটা অবশ্য বাইরের লোকের

নজরের বাইরে। চোখের কোলে জমে থাকা কালো-রঙ কাজলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই পাড়ার লোকের কথা ভেবে প্রতিমা হাসে। মফস্বল সহরের এই বাড়ির আবহাওয়া, ফুলের টব, রেডিও, প্রসাধন তার বুকের আগুন নেভাতে পারে নি। এই সাত বছরের বিবাহিত জীবনের রঙ তার কাছে জলো কালির মত নিরর্থক হয়ে গেছে।

তাই আজও তাকে রাত জেগে থাকতে হয়। চোখের কোলে কালো কালিকে ঘন হয়ে জমবার সুযোগ দিয়ে। খাটের ওপরের পুরু নরম গদীটাকে বড় বেশী কঠিন মনে হয় ওর। ঘুম-তাড়ানো জ্বালা-ধরা চোখে জল আসতে চায়। কিন্তু মাঝপথে থেমে পড়ে। কি হবে কেঁদে? স্ত্রীর অধিকার নিয়ে যার কাছ থেকে সাড়া পায় নি, দুফোঁটা চোখের জলের মূল্য সেখানে কতটুকু? কিছু না। রাগে, অভিমানে, আক্রোশে হাত দিয়ে চেপে ধরলো মাথার বালিশটাকে। নিজের মনের কান্নায় ভিজতে লাগলো প্রতিমা। ব্যর্থ হয়ে গেল ওর সব কিছু, ওর সযত্নলালিত দেহের সুষমা। পড়াশুনো, সাঁতার কাটা, সিনেমা দেখা সব আজ ওর কাছে বিষিয়ে উঠেছে। এক এক সময় ভাবে, অতীতকে আর টানবে না। যা পেয়েছে তাই নিয়ে সুখী থাকবে জীবনে। ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চিন্ত হয়ে। কিন্তু পারে না।

পাশের ঘরে স্বামী একগাদা কাগজ সামনে নিয়ে টেবিলল্যাম্পের নীচে বসে আছে। বিয়ের পর থেকে এ নিয়মের ও আজ পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম দেখে নি। অ্যাশ-ট্রে হয়তো এতক্ষণে ছাই আর সিগারেটের ভগ্নাংশে অর্ধেকের বেশী ভরে উঠেছে। বারবার উঠে কাঁচের কুঁজো থেকে নিজেই গ্লাসে জল গড়িয়ে খাবে। শব্দ হবে চেয়ার সরাবার, এবং দুটো-একটা ক্ষীণ কাশির। কয়েকবার জ্বলে উঠবে বারান্দার আলো। শব্দ আসবে, কাপসা হয়ে আসা চোখে জল ছিটোবার। প্রতিমা জানে, তবু ঘরের আলো নিভবে না। নিস্তব্ধতায় ঢেকে যাবে চারধার। শুধু প্রতিমার মাথার কাছে টাইমপিস্‌টা একটানা টিক্ টিক্ শব্দে বাজতে থাকবে। ওঘরের মানুষটা তখনো মুখ গুঁজে বসে থাকবে আলোর নীচে। মন চলে যাবে প্রাচীন ভারতে। মৌর্যযুগের রাজা-প্রজা, খুঁটিনাটি ঘটনা, ঐশ্বর্য, যুদ্ধবিগ্রহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। হাই-পাওয়ারের চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে সাদা কাগজের গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটবে কালো কালির আঁচড়।

ঘর অন্ধকার। ভাবতে ইচ্ছে করে প্রতিমার। ফেলে-আসা দিনগুলো মনের আয়নায় ছায়া ফেলে। বেশী নয়। আজ থেকে গত নটা বছরই যথেষ্ট ভাবনার পক্ষে। কলেজের সেই দিনটায় কি দুর্বলতাই না তাকে পেয়ে বসলো। কত আশা

মনে দানা বাঁধলো ইতিহাসের ক্লাসে। পড়াচ্ছিল তরুণ অধ্যাপক অজয় সোম। নতুন এসেছে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। এক মাথা কোঁকড়া চুল। শরীরে গ্রীক ভাস্কর্যের প্রতিচ্ছায়া। পড়াতে পড়াতে চোখের দৃষ্টি ছাত্রীদের মাথা ডিঙিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে কোন সুদূরে চলে গেছে। আবৃত্তির মত উঁচু-নীচু পর্দায় ওঠা-নামা করছে কথাগুলো। তন্ময় হয়ে শুনতো প্রতিটি মেয়ে। তারাও চলে যেত অতীত ইতিহাসের সেই কনৌজ, পাটলীপুত্র এবং উজ্জয়িনীতে।

সেদিন যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল অজয় সোম। চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজের কথা বলতে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার চোখ-মুখ……"He dealt a blow to the prestige and power of Jayachandra, the great Hindu king, as he carried off Sanjukta, the king's daughter in 1175 A. D.... indeed, he was a true hero of ancient Indian history……" উঁচু-নীচু পর্দায় ওঠা-নামা করছিল কথাগুলো। আচ্ছন্ন হয়ে যেন গিলছিল মেয়েরা। তারপর একসময় পড়া থামলো। অধ্যাপক বেরিয়ে যাওয়ার পরেও যেন মেয়েদের উঠতে ইচ্ছে হলো না। ঘর থেকে বেরোলেই তো সামনের রাস্তার ট্রাম-বাসের শব্দ তাদের ফিরিয়ে আনবে আধুনিক ইতিহাসে!

প্রথম দিন থেকেই অধ্যাপক অজয় সোম প্রতিটি মেয়ের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল প্রতিমা রায়। একুশ বছরের জীবন। ফলাফলের কথা না ভেবে এগিয়ে যাওয়ার বয়স। মনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সদা পদচারণ। ভাবনা-চিন্তা রাতে ঘুম কেড়ে নিল প্রতিমার চোখের। ছটফট করে সারাটা রাত কাটতো অন্তর্দ্বন্দ্বে। অন্যান্য মেয়েরা লক্ষ্য করতো 'প্রফেসরস্ রুমে'র দিকে প্রতিমার এগিয়ে যাওয়া। কখনও বা বালীগঞ্জে অজয় সোমের ভাড়া বাড়িতে। প্রশ্ন লিখে দেখানো। খারাপ হলে কাটাকাটি করা। আবার দেখানো। লাল কালিতে ভরে ফেলা প্রতিমার ইতিহাসের খাতা। সব কিছু মিলিয়ে মেয়েদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন। প্রতিমাকে নিয়ে কিছু হাসাহাসি। কিন্তু সব একদিন চুপ করে গেল অধ্যাপক অজয় সোমের কাঁচের ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকা ছুটো নির্বিকার চোখের দিকে চেয়ে।

কিন্তু মেয়েদের ভুল ভাঙলো কিছুদিন পরেই। বি. এ. পরীক্ষার পরে যখন সবাই শুনলো প্রতিমা রায়ের সাথে অধ্যাপক অজয় সোমের বিয়ের কথা, প্রত্যেকেই বললো—"এ আমি আগেই জানতাম।" প্রতিমার বাড়িতে অবশ্য একটু ক্ষীণ আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু সেটা ক্রমশঃ মিটিয়ে পড়লো শিক্ষিতা মেয়ের যুক্তিতে।

প্রতিমার চিন্তায় খানিকটা ছেদ পড়লো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো। মেঘ ডাকলো একবার। জানলার কাচে বৃষ্টির শব্দ। প্রতিমা আবার ডুব দিল ভাবনার অতলে। বিয়ের দেড় মাস পরেই ওরা উঠে এসেছে সোদপুর ওল্ড স্টেশন রোডের এই বাড়িতে। কোথাও অভাবের চিহ্ন নজরে পড়লো না প্রতিমার। কিন্তু ভুল ভাঙলো ওর। এবং তা কিছুদিনের মধ্যেই। প্রতিমা এখনও ভাবে আর নিজের ওপরে রেগে ওঠে। এত বুদ্ধিমতী হয়েও সে অজয় সোমের ঐ চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকা চোখ দুটোকে তখন চিনতে পারলো না। পারলো ও অনেক পরে। অধ্যাপকের জীবনে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন কোথায় আজ প্রতিমা তা উপলব্ধি করেছে। অজয় সোম মৌর্যযুগের ওপরে থিসিস্ লিখছিল। শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণতা, সম্মানের ভাবনা অজয় সোমের চোখে-মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিল। চোখের অবস্থা দেখে ডাক্তার পড়াশুনা করতে বারণ করেছিলেন। শোনে নি। শুধু সময় বাঁচানো এবং চোখের একটু ভার কমাবার জন্য খোঁজ করেছিল আর একটি লোকের। তাই রাতের পর রাত সোদপুর ওল্ড স্টেশন রোডের এই বাড়িটার ঐ পাশের ঘরটাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জেগে থাকতো বিনিদ্র চোখে। অজয় সোম খস্ খস্ করে কলম চালাতো কাগজে। মাঝে মাঝে প্রতিমাকে হুকুম করতো কোন বইয়ের নির্দিষ্ট পাতা খুলে দিতে। যন্ত্রচালিতের মত প্রতিমা একগাদা বইয়ের মধ্য থেকে ঠিক বই টেনে পাতা বের করে এগিয়ে দিত স্বামীর দিকে। একটু দেরি হলে অজয় সোমের কপালে বিরক্তির রেখা দেখা দিত। রাত আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত চলতো নিঃশব্দে তাদের কাজ। তারপর দুটো ক্লান্ত শরীর, পাশের ঘরের বিছানায় নিজেদের এলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়তো।

প্রতিমা প্রথমে মেনে নিয়েছিল এ কাজ। এক নতুন আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছিল। কিন্তু ক্রমে হাঁফিয়ে উঠলো। পাতা খুঁজতে খুঁজতে একদিন প্রতিমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। লক্ষ্য করলো অজয় সোম। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়লো। তারপর একটু হেসে বললো—"যাও, তুমি শুতে যাও। আমি এইটা শেষ করে যাচ্ছি।" এর পরে অজয় সোম আর কোনদিন ডাকেনি স্ত্রীকে তার কাজে সাহায্য করতে। চোখের জ্বালা সত্ত্বেও নিজেই মেতে রইলো নিজের কাজে। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চা খাওয়া। দুজনের মধ্যে দুএকটা কথাবার্তা। ব্যস—সারা দিনের মধ্যে ঐটুকুই। সারাটা দুপুর প্রতিমা শুয়ে-বসে কাটায়, রেডিও খোলে, বন্ধ করে। বিকেলে বারান্দায়-বসা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিমা উঠে গিয়ে দাঁড়ায় রেলিং ধরে। ছোট-ছোট ছেলেরা এই সময় খেলে মাঠ থেকে ঘরে ফেরে। দূরে লাল আকাশটাকে দেখে

প্রতিমার বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে একটা ব্যথা। রাস্তার বিস্মিত, ঈর্ষাভরা চোখগুলোকে তাকাতে দেখে শুষ্ক হাসে মনে মনে প্রতিমা।

আর রাতে এঘরে জেগে থাকে দুটো চোখ। ওঘরে পড়াশুনায় ডুবে থাকে আর একটা জীবন। সে এখন নিজেই বই খোলে। ছোট ছোট অক্ষরগুলোতে জোর করে চোখ বুলোয়, কালি ফুরিয়ে গেলে কলমে কালি ভরে। জল খায়। চোখেও দেয় মাঝে মাঝে। আর কখনও কখনও পাশের টেবিলের উপরে রাখা বেহালা তুলে নেয়। ছড়ের টান দেয় তার তারে। খেতে-খেতে একদিন প্রতিমার প্রশ্নের জবাবে অজয় সোম বলেছিল—"It is for relaxation and concentration of mind....."

ঢং ঢং করে ঘড়িতে দুটো বাজলো। প্রতিমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। অতীত থেকে ফিরে এলো বর্তমানে। পাশের ঘর থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে টেবিলল্যাম্পের একটুকরো আলো এসে পড়েছে বারান্দার মেঝেতে। ঘরটা নিস্তব্ধ। স্বামী হয়তো অতীত ভারতের ইতিহাস-চিন্তায় ডুবে আছে। প্রতিমা ভাবে কি স্বার্থপর আর কি পাগল এই লোকটা। শুধু নিজের সম্মান! আর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা মানুষটাকে জাগিয়ে রেখেছে এত রাত পর্যন্ত! আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে কলেজ থেকে। চোখের যন্ত্রণায়। স্ত্রীকে এসে বলেছে সে কথা। আজ অন্ততঃ একটা দিন বাদ দিতে পারতো লেখা-পড়া। রাগ এবং বিরক্তিতে জলতে লাগলো প্রতিমা। ভাবলো আজ আর উঠবে না বিছানা ছেড়ে, স্বামীকে শুয়ে পড়ার তাগাদা দিতে। ভাবলো সে-ই হয়তো উঠে আসবে। কিন্তু অজয় সোম এলো না। প্রতিমার মাথার কাছে রাখা টাইমপিসটার কাঁটা আরো পনেরোটা মিনিট এগিয়ে গেল। প্রতিমার হঠাৎ খেয়াল হলো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য দিন এর মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ-ছবার জল খেতে ওঠে। দু-তিনবার বেহালায় হাত দেয়। চেয়ার সরাবার শব্দ হয়।—এক অজানা আশঙ্কায় প্রতিমা সংশয়বোধ করে। বিছানা ছেড়ে উঠে ও ধীরে ধীরে জানালার কাছে যায়। পাট দুটো খুলে দিতেই বাইরের এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরে ঢোকে। প্রতিমার শাড়ীর আঁচলে, চুলে শিহরণ তোলে। বাইরে বৃষ্টি ধরে এসেছে। টিপ্ টিপ্ করে জল পড়ছে এখন। বাড়ির পেছনে একমাঠ জল, মাটির গন্ধ, ব্যাঙের গোঙানি, ঝিঁঝি পোকার ডাক। প্রতিমা কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর জোর করে ওঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড কি ভাবলো। তারপর পর্দাটা আস্তে সরিয়ে ধীর পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করলো। কিন্তু এগোতে গিয়ে যেন

পা আটকে রইলো মেঝেতে। মাথার ওপরে টেবিলল্যাম্প জলছে। পাশের ছোট কাঠের টেবিলের ওপরে বেহালাটা পড়ে রয়েছে। আর অজয় সোম টেবিলের ওপরের একগাদা কাগজের স্তূপের মধ্যে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে। হয়তো ঘুমোচ্ছে। জলে ওঠে প্রতিমা। পাগলের মত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে ঐ কাগজগুলো। মোটা মোটা বইগুলো। কি শক্তি বইয়ের ঐ ছাপার অক্ষরগুলোর! রাতের পর রাত জাগিয়ে রেখেছে। রেখেছে অজয় সোমকে। পথে-ঘাটে, কলেজে-বাড়িতে সব জায়গায় কিভাবে লোকটার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে!

এগোতে গিয়ে প্রতিমার পায়ের শব্দ হয়। অজয় সোম উঠে বসে—"কে, প্রতিমা?" চমকে উঠলো প্রতিমা। আজ এই কবছরের বিবাহিত জীবনে অজয় সোমের এরকম গলা কোনদিন শোনেনি ও। যেন কোন সুদূর থেকে ভেসে এলো ডাকটা। প্রতিমা আশ্চর্য হয়। কিন্তু ভাববার সময় পায় না। অজয় সোম আবার বলে—"ভাবলাম ঘুমিয়েছো। তাই বিরক্ত করি নি।—কত কাজ বাকী রইলো। কিন্তু চোখটা যেন কিরকম ঝাপসা হয়ে এলো। ভাবছি কালই একবার ডাক্তার দেখাব। থাক, এক গ্লাস জল দেবে?"

প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে প্রতিমার বেশীক্ষণ লাগলো না। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এলো। অজয় সোমের হাতে গ্লাসটা দিতে গিয়ে প্রতিমার হাত কেঁপে উঠলো, স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে। নিভে যাওয়া যেন দুটো চোখ। হাতড়ে হাতড়ে গ্লাসটা ধরা। আজ এই প্রথম চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো প্রতিমার। খানিকটা জল খেয়ে ঐ ঘরের মধ্যেই অজয় সোম চোখে-মুখে জলের ছিটে দিলো। চোখ-মুখ মুছে চশমাটা চোখে দিয়ে তাকালো দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে। কিন্তু ভাবান্তর ঘটলো না মুখে। ভাবলো ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিমার হাত ধরে তাই অজয় সোম পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

পরের দিন বিকেলের দিকে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সী থামলো। সহানুভূতিভরা কতকগুলো কৌতূহলী দৃষ্টি আশেপাশে উঁকি মারলো। সকালেও এরা দেখা দিয়েছিল—যখন এমনি এই ফিরে আসার মত, অধ্যাপক অজয় সোম আর তার স্ত্রী প্রতিমা মেডিকেল কলেজের দিকে পা বাড়িয়েছিল। গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে প্রতিমা স্বামীকে হাত ধরে নামালো। তারপর মুখ নীচু করে লাল কাঁকুড়ে পথ বেয়ে বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল—অনেকগুলো কৌতূহলী চোখকে পেছনে ফেলে। শোয়ার ঘরে ঢুকে প্রতিমা স্বামীকে বসিয়ে দিল বিছানায়। স্তব্ধ হয়ে রইলো

ছুটো মানুষ। জানলার সামনে হাতের উপরে মুখ রেখে পেছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে রইলো প্রতিমা। বাইরের আকাশে সন্ধ্যার আগমনের আয়োজন চলছে। টকটকে লাল যেন আজ পশ্চিমের আকাশটা। মাঠ থেকে খেলে ছেলেরা বাড়ী ফিরে গেল কিছুক্ষণ আগে। তাদের গোলমালের রেশটুকু যেন এখনও বাজছে প্রতিমার কানে। বাইরের নিমগাছে কি একটা পাখি ডাকছে একমনে। অজয় সোম হঠাৎ বললো—"ঘরটা এত অন্ধকার কেন? জানলাটা খুলে দাও না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে নাকি?"

জানলা খোলার শব্দ হলো না। শব্দ হলো ফুঁপিয়ে কান্নার। প্রতিমা কাঁদছে। আর ধরে রাখতে পারে নি নিজেকে। অজয় সোম লজ্জা পেল। খাট থেকে নেমে পা ঘষতে ঘষতে জানলার দিকে এগিয়ে চললো। পায়ে লেগে একটা টুল সরে গেল। শব্দ হলো। জল-ভরা চোখে মুখ তুলে তাকালো প্রতিমা। অজয় সোম এগিয়ে আসছে। ছুটো হাত দিয়ে যেন নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। আজ আর কপালে বিরক্তির রেখা নেই। কপালের চামড়ায় যেন অসহায় উৎকণ্ঠার রেখাপাত ঘটেছে। কিন্তু প্রতিমা স্তব্ধ হয়ে দেখলো একজোড়া চোখ। অস্বাভাবিক স্থির। ডাক্তার যদিও লাভ নেই ভেবে অপারেশনের পথ অবলম্বন করেন নি তবু রক্তমাংসের শরীরে চোখ ছুটো যেন সত্যি আজ প্রাণহীন, নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। যে ছুটো নিস্পন্দ চোখ প্রতিমার মাথা ছাড়িয়ে দেয়ালের গায়ে আটকে রয়েছে, প্রতিমার মনে হলো সে ছুটো যেন আজ সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পাথরের চোখের মতই। সে চোখের দৃষ্টি যেন আজ কিছুতেই প্রাচীন ভারতের উজ্জয়িনী, কনৌজ আর পাটলীপুত্রের পথের ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না।

বকুলের মরসুম ॥ অমলেন্দু শূর

অনেকটা নাওয়া-খাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেজ যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে স্বাতী। কাজের কি আর অন্ত আছে! বিয়ের ব্যাপার···মস্ত ঝঞ্ঝাট।

বিয়ে স্বাতীর পুতুলের। হাতে আর সময় নেই মোটে। মাত্র তিনটে দিন। তার পরেই তো শিউলী আসবে ওর ছেলেকে নিয়ে। সঙ্গে থাকবে একপাল বরযাত্রী। তাদের আদর-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়া মস্ত ঝঞ্ঝাট!—তাই তো····· প্রমাদ গোণে স্বাতী।

চব্বিশটা ঘণ্টার বেশীর ভাগ সময়ই কাটছে ওর খেলাঘরে। বিরাট খেলাঘর। নিউ আলিপুরের রায়বাহাদুর সিন্‌হার বাড়ীটার ওই ঘরখানা যেন একটা পুতুলের মিউজিয়াম। হাজারো দেশী-বিদেশী রঙ-বেরঙের পুতুলের বিরাট সমাবেশ। আর সবই বিভিন্ন দেশের ক্যাটালগ দেখে সেরা সেরা পুতুল সংগ্রহ করেছেন রায়বাহাদুর ……স্বাতীর জন্যে।

স্বাতীরও বয়স তো বেড়েই চলেছে, অথচ আশ্চর্য, এখনো ওর ছেলেমানুষী গেল না! ঠিক তেমনি শিউলী। হুবহু একরকমের! নীতা-রিতা-নিনা-রিণার মতও তো হতে পারত এরা দুজনে। কেবল ড্রাইভিং, সুইমিং, রাইডিং···এমনি আরও সব উদ্ভট জিনিস নিয়েই আছে ওরা। স্বাতীর এসব যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। তবুও কেমন যেন মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয় ওর।

কাজ, কাজ আর কাজ! স্বাতী ডুবে গেছে কাজের মধ্যে। তবে ভরসা, দাদু আছেন। দাদু-দিদারা নৈনীরই স্থায়ী বাসিন্দা। কেবল দাদুই এসেছেন কলকাতায় দিন কয়েকের জন্যে। মেয়েলী আচার-টাচার যা কিছু দাদুই বুঝবেন……ভালো করে।

তবুও স্বাতী এখুনি একটা কথা জানে: কাজের স্রোতে এখন হাবুডুবু খাওয়ার জন্য কিছু বুঝতে না পারলেও……আরো কতগুলি প্রহর আসবে···যখন চুপে চুপে, নিঃশব্দে, পার হয়ে যাবে অস্থহীন মুহূর্তগুলি ঠিক তখন স্বাতী নিশ্চয়ই ব্যথা পাবে। পাবেই তো···বুবুর জন্যে! ওর খেলাঘরের সবচেয়ে প্রিয় পুতুলটা। তারই যে বিয়ে!

সকালের রোদ্দুর দুপুরে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। জানলার বাইরে, ওপাশের মাঠে দুচারটে শালিক লঘুপায়ে ঘুরছে আপন মনে। ওদের মতন স্বাতীরও খেয়াল নেই। দাদু এসে ঢুকলেন খেলাঘরে।

—"কই গো, বলি খেতে-টেতে হবে না? স্বাতী-সুন্দরী পাশে না বসলে যে বুড়ো বরের আবার খাবার রোচে না। চলো—চলো।"

কাজল কালো চোখ দুটোয় আলতো কৃত্রিম রোষ ছড়িয়ে স্বাতী বলে;—"উরে-ব্বাপ, কি অসভ্যই হয়েছ দাদু! ফের যদি ওসব বলবে তো আড়ি করে দেবো বলে দিলুম। হ্যাঁ···।"

—"নাকি?" দাদু হাসেন; "তা এই বুড়োহাবড়াকে আর কেন ভালো লাগবে শ্রীমতীর। কিন্তু স্বাতীদেবী, আমার সন্ধানে যে একজন ভালো রাজপুত্তুর আছে……"

—"আ—বার!" স্বাতী চেঁচিয়ে ওঠে, "দাদু তুমি যা অসভ্য হয়েছ না···উঃ। সত্যি বলছি আমার পুতুলের বিয়েটা চুকে যাক ভালোয় ভালোয়, তারপর আর কেমন তোমার সঙ্গে কথা বলি দেখবে···"

—"বটে বটে···" দাদুর চোখে-মুখে খুশির আভাস, "আচ্ছা তাই হবে গো, তাই হবে···এখন চল দেখিনি।"

পর পর দুটো দিন কর্পূরের মতনই উবে গেল। কি করে যে কাটল স্বাতী জানতেও পারল না। এ বাড়ির কেউ না! গোটা বাড়িটাতেই পরিবর্তন এসেছে। ছাদে, লনে প্যাণ্ডেল তৈরি হয়েছে। ফটকে মন্দিরের চূড়োর মতন গেটের মাথায় নহবতের আসর। দু' চারটে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে আগামী কালের বিয়ের সাজ-সজ্জায়। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে এসেছে দই-সন্দেশ-রসগোল্লা-পান্তুয়াও। আত্মীয়-স্বজনে গমগম করছে সারা বাড়ি। তবুও স্বাতীর সংশয় ঘোচে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করে, "বাপি, নেমন্তন্নের আর কেউ বাকী থাকল না তো?" রায়বাহাদুর মুখ থেকে সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সহাস্যে বললেন, "পাগল, বাকী থাকলেই হলো, কিন্তু হঠাৎ একথা·····?"

"এ—মনি।" স্বাতী বাবার চুলগুলি নিয়ে খেলা করতে থাকে।

মিত্রাদেবী বলে: "বাপস্, স্বাতীর পুতুলের বিয়েতেই এত খাটুনি, আর যখন আমার স্বাতীর বিয়ে হবে তখন·····"

—"যা বলেছিস মিত্রা।" সহাস্যে মায়ের কথায় সায় দিলেন দাদু, "বুড়ো হয়েছি আর কটা দিনই বা বাঁচব, তাড়াতাড়ি যাতে ওর বিয়েটা হয়·····"

স্বাতী দাদুর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে শাসায়। বলে: "চুপ করবে দাদু·····"

বড় পিসিমা এবারে যেন ফেটে পড়েন, "কেন, চুপ করবে কেন শুনি? বলি, প্লাস্টিক্, সেলুলয়েডের পুতুল নিয়ে থাকলেই কি চলবে? সত্যি, ভালো লাগে না বাপু এই সব পুতুল-নুতুলের বিয়ে·····"

স্বাতী এবার সত্যিই চলে যায় দুম্‌দাম্ করে পা ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে সকলের হাসি আর কথার গুঞ্জন। আরও একটু পরে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এল স্বাতী। রেলিঙ ছুঁয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল দূরে। ছায়া-ছায়া দিগন্তে। একটু একটু করে অন্ধকার নামছে। ওপরে নীল আকাশ। তারায় ভরা। আর এখানে স্বাতীর চোখে, মুখে, চুলে এলোমেলো হালকা বাতাস। এবং এক অজানা খুশির আলোয় ঝলমল মনের আকাশ। ·····বেশ লাগছে, দাদু-বাবা-মা-পিসিমার কথার জবাবের জন্য একটা মানুষেরই কথা ভাবতে!!

বিয়ের দিন। সকাল থেকে শানাই বাজছে আশাবরী রাগিণীতে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর কানে বেজেছে হাজারো কোলাহল। এত মানুষের ভিড় এর আগে কখনো

স্বাতী দেখে নি ওদের এই বাড়িতে। শেষটায় সন্ধ্যা নামল মহানগরীতে। শানাই-এ সুর পরিবর্তন হয়ে সাহানার সুর বাজছে। বরযাত্রীরা এসেছে। ওদের দিকে আবার ভাল করে তাকাল স্বাতী···হ্যাঁ, শৈবাল এসেছে। শিউলীর দাদা শৈবাল চৌধুরী।

শুনতে পুতুলের বিয়ে। কিন্তু কোনদিকে···কিসে কম! সচরাচর বিয়ে-বাড়িতেও যা দেখা যায় না···তাই এখানে। সেই ছোটাছুটি, হাসাহাসি, হৈ-হুল্লোড়! অপূর্ব লাগছে স্বাতীর।

স্বাতী বললো: "কি রে শিউলী, সবাই এসেছে তো?"

—"সব্বাই।" শিউলীর চোখে-মুখে উপচে-পড়া খুশির প্লাবন: "আমার কিন্তু বেশ লাগছে।"

নিনা-রিনারাও চেঁচিয়ে উঠল: "আমাদেরও।"

গোটা বাড়িটায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালো স্বাতী। এখানে-ওখানে···সবখানে। স্বাতী দেখল সবার চোখে একই খুশির আমেজ। মুখে একই হাসির ছটা। হয়ত মনেও একই অনুভূতি। বুবুর বিয়ে সার্থক! স্বাতীর পুতুলের বিয়ে সার্থক!!

একসময় ভিড়টা একটু লঘু পেয়ে শৈবাল চৌধুরী ডাকল, "এই···এই স্বাতী শোনো।"

স্বাতী চোখে ঢেউ তুলল। মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো: "উঁহু, এখন নয়···পরে···"। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কোণ থেকে সরে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে লুকাল স্বাতী।

আর শেষটায় বিয়েও হয়ে গেল। স্বাতীর মেয়ের সঙ্গে শিউলীর ছেলের। বুবুর সঙ্গে বরুণের। একটা জড় পুতুলের সঙ্গে আর একটা জড় পুতুলের। তারা কেউ কিছু জানল না। তারা কেউ কিছু বুঝল না। কতগুলি মানুষের সখের খেয়ালের পরিসমাপ্তি ঘটল তাদের অজান্তে। তবুও তাদের বিয়ে হলো। এটা সত্যি।

শিউলীরা চলে গেছে। শৈবালও। নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবরাও ফিরে গেছে। অনেক আত্মীয়-স্বজনও বিদায় নিয়েছে। নিউ আলিপুরের এই বাড়িতে এখন ভাঙা-হাটের নিস্তব্ধতা। নহবতের আসর ঝিমিয়ে পড়েছে। বাইরে রাত গভীর।

তবুও স্বাতী বুঝতে পারে না—বুবুকে শিউলীদের গাড়ীতে তোলবার সময় ও কেঁদে ফেলেছিল কেন? স্বাতীর বিস্ময় লাগে, সত্যি তো কেন কেঁদেছিল! কি জানি, এ অশ্রুর উৎস কোথায়! কোন গভীর গহনে।

পরদিন চায়ের টেবিলে দাদুই দিলেন মস্ত সুখবরটা। স্বাতী আসছিল টেবিলে। দাদুর কথা শুনে বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। দাদু তখন বলছেন: "সবই ঠিক করে

ফেললাম, স্বাতীর বিয়েটা শৈবালের সঙ্গেই হবে। ওর বাবা বলছিল তারও নাকি এই ইচ্ছে। আর ছেলেটি তো খুবই ভালো……"

সেই মুহূর্তে আর কিছুই শুনতে চাইল না স্বাতী। পালিয়ে এলো। পালিয়ে এলো ছুটে ওখান থেকে। ঠিক তখন স্বাতীর মনের নরম আকাশটায় হাজারো সোনালী খুশির টুকরোয় ভরে গেল··হাজারো হীরার কুচি তারার মতন। আর স্বাতী জানল : মরসুমী ফুলের মতন এই আনন্দ! বিচিত্র জীবনের এই মরসুম আর এক নতুন রূপ নিয়ে এসেছে। তাই পুরোনোরা নিশ্চয়ই এবার হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতল গর্ভে। হয়তো পিসিমার কথাই ঠিক!

তবুও তো স্বাতীর সন্দেহ হয়……ওর মনের এই যে খুশি··দাদুর সকাল বেলার চমক-লাগানো কথার চমৎকারিত্বে আর নতুনত্বে, সেখানে কি পুরাতনের আসন একেবারেই শূন্য হয়ে গেল। এতদিনের এত আদর-সোহাগের বুবুর জন্য একটুও জায়গা নেই !!

এই ভোরের মিষ্টি-রোদ-জড়ানো সামনের বকুল গাছটার দিকে তাকাল স্বাতী।

এখন বুঝি বকুলেরই মরসুম।

অন্তরীণ ॥ শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী

ঠিক কলেজ যাবার মুখে চিঠিটা পেল আলপনা। খামের ওপরকার লেখা দেখে বুঝল সুনন্দা লিখেছে। বেশ কিছুদিন পরে ওর পত্র এলো। আলপনা খুশি হয়ে উঠল। আর এই খুশির সঙ্গে একটা প্রত্যাশা বুকের ধুকধুকানিটাকেও বাড়িয়ে দিল। হাতটা ওর কাঁপছিল—অপ্রত্যাশিত এক প্রাপ্তিযোগের আনন্দে।

বড় আশা করে খামটা খুলেছিল আলপনা। কিন্তু মোটা প্রায় তুলোট কাগজের মত পুরু ভাঁজ করা কাগজে সাত আট লাইনের বেগার শোধ দেবার মত চিঠি দেখে ওর যত না রাগ হলো তার থেকে দ্বিগুণ রাগ হলো নরেনের মৃত্যু সংবাদের কথায়। নরেন সুনন্দাদের চাকর।

যে মন এইমাত্র এক সুন্দর আশার ছোঁয়ায় ওকে ভরিয়ে দিয়েছিল, একটা গভীর বিতৃষ্ণায় তা ভরে গেল। ক্ষোভে, অভিমানে চিঠিটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে

দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল আলপনা। প্রথম ক্লাশটা হয়ত বা করাই হবে না।

ক্লাশে বসেও মনের বিরাগ দূর হলো না আলপনার। হবার কথাও নয়। কোথায় ভেবেছিল—ওর রোমান্টিক মন যাকে ঘিরে স্বপ্নজাল বুনেছে এতদিন ধরে তারই ডাক্তারী পাশের খবর কিংবা তার সম্বন্ধেই অন্য কোন বিশেষ সংবাদ —তা না, কোথাকার এক চাকরের মারা যাবার খবর। সুনন্দার স্বভাব আলপনার অজানা নয়। কিন্তু ঠাট্টারও একটা সীমা আছে। এতদিন পরে চিঠি লিখল তাও এই সংবাদ জানিয়ে!

নরেনকে আলপনা একবারই দেখেছে। পূজোর ছুটিতে যেবার পাটনায় সুনন্দাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল সেবার। ওই প্রথম এবং শেষ। চাকর হিসেবে ছোকরা বিশেষ মন্দ ছিল না। সব কাজই বেশ করে দিত হাত চালিয়ে। তবু সুনন্দা থেকে শুরু করে ওর বাবা মা পর্যন্ত নরেনের ওপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ছাড়া কথাই বলত না। গিয়ে দ্বিতীয় দিনেই তার নমুনা পেয়েছিল আলপনা।

সুনন্দা ডাকল—"নরেন, এ্যাই নরেন···গেল কোথায় উল্লুকটা।"

—"এই যে দিদিমণি।"

—"সাড়া দিতে কি হয়···যা তো নীচের ঘর থেকে আমার জুতোটা নিয়ে আয়।"

জুতো নিয়ে একটু পরেই নরেন এলো। দেরি হয় নি তবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে সুনন্দা—"হারামজাদা, কোন কাজে পাঠালে একেবারে ছ'মাস লাগিয়ে দেবে··· করছিলি কি এতক্ষণ!····· ঐ ছাখো ব্রাশটা আনিস্ নি কেন?"

—"বলেন নি তো আপনি।"

—"জুতোর সঙ্গে যে ব্রাশটা আনতে হয় এটাও বলে দিতে হবে বুঝি। ন্যাকা বজ্জাত কোথাকার···যা দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসবি।"

নরেন চলে গেল। ওর চোখ দুটো কেমন করুণ মনে হচ্ছিল। মুখখানাও রাঙা হয়ে উঠেছিল। আলপনার সামনে এরকম বকাঝকা করাতে বোধ হয় আঘাত পেয়েছে ও।

—"আচ্ছা, ওকে এরকম মুখ করিস্ কেন রে!" আলপনা বলে একটু হেসে।

—"আর বলিস্ না—ভাল কথা বললে একেবারে মাথায় ওঠে।"

—"আমার কিন্তু তোর অত বকাঝকা ভাল লাগে না।"

—"ওসব তুই বুঝবি না। চল্ তাড়াতাড়ি—ওদিকে বোধ হয় 'শো' শুরু হয়ে গেল।"

যতদিন আলপনা ছিল ওখানে ততদিন দেখেছে যে বাড়ির মধ্যে এক নবাগতা

সে ছাড়া নরেনের সঙ্গে কেউই তেমন ভাল মুখে কথা বলে না। আলপনা কোনকালে চাকরবাকরদের ওপর হুকুম চালাতে পারে না। কাজ করে দিলেই ও যেন কৃতার্থ হয়ে যেতো। কয়েক দিন যেতে না যেতেই আলপনা দেখল নরেনকে আর হুকুম করতে হয় না। মুখে হাসি ফুটিয়ে সব কাজই তার করে দিতো চটপট করে।.....

বাস্তবিক চাকরটা তো নেহাৎ মন্দ ছিল না। নাঃ, নরেনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ওর দুঃখিত হওয়াই উচিত ছিল। মিছিমিছি ওরকম তাচ্ছিল্য করে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে ও অন্যায়ই করেছে। চাকর হলেও মানুষই তো! আর ভাবল আলপনা..... আর চিঠিটাতে থাকতেও তো পারে অশোকদার খবর—সুনন্দাটা যা দুষ্টু—ঠিক হয়ত উল্টো পিঠে পুনশ্চ দিয়ে ছোট ছোট করে লিখেছে··কিংবা শেষের দিকে। তাড়াতাড়ির মাথায় ওর রাগটা চড়ে গিয়েই যত গোল বাধাল। ওকে রাগাবার জন্যই সুনন্দার ওটা কারসাজি! মনে মনে একটু হাসি আসে আলপনার। একটু আনন্দও যে পায় না তা নয়।···

বাস্তবিক সেবার অশোকদাকে কিরকম লজ্জায়ই না ফেলে দিয়েছিল ওই সুনন্দাটা। ওই যত নষ্টের গোড়া। ফটোটা নিয়েছে তাতে বাড়ি মাত করে··ছি ছি ···ভাবতেও লজ্জা লাগে ওর। ওর ফটো কেউ নিলে অশোকদা ছাড়া আর কে ই বা নিতে পারে। আলপনাও কি কম রাঙা হয়ে উঠেছিল সেদিন। আগে জানলে ঘুণাক্ষরেও বলত না ব্যাপারটা। নিজে খুঁজে দেখে যখন পেতো না তখন চুপ করে যাওয়াই ঠিক হতো। ছি ছি, সুনন্দার বাবা-মা সবাই জেনে গেলেন। সুনন্দাটাও এত বোকা আর বেহায়া যে সবার সামনেই বলে ফেলল—"জানিস্, বোধ হয় মেজদা নিয়েছে। এমনিতে হয়তো লজ্জা পেয়েছে।"

আলপনার অশোকদা অর্থাৎ সুনন্দার মেজদা তখন কলেজে গিয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজে পড়া স্মার্ট ছেলেও কিরকম রাঙা হয়ে গিয়েছিল সেদিন কথাটা শুনে।

একটা অ্যালবামে অনেক ফটো নিয়ে এসেছিল আলপনা। নিজে ও ভাল ফটো তোলে। সুনন্দাকে সেই ফটোগুলো দেখান দরকার। তাই নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। একটা ফটো ছিল আলপনার নিজের। ডেভেলপ করা—বেশ বড়। ভারী সুন্দর হয়েছিল সেখানা। এত সুন্দর স্বাভাবিক ফটো কোনদিন কিন্তু ওর ওঠে নি। তাই অনেকের অনুরোধেও ফটোটা আলপনা হাতছাড়া করে নি। সেই ফটোই একদিন অ্যালবামে না দেখে হঠাৎ একেবারে সর্বহারার রিক্ততা ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। কি হলো?—নেগেটিভটাও যে ও হারিয়ে ফেলেছে। যাই হোক অনেক খোঁজাখুঁজিতেও পেলো না। সুনন্দা তো নেয়ই নি। ও যেরকমভাবে সবাইকে

জেরা করে ফিরছে তাতে ওকে সন্দেহ করা চলে না। আর যা পেটআল্‌গা সরলত ওর তাতে লুকিয়ে রেখে মজা দেখবার স্বরও সয় না। সুনন্দা ওর মাকে বাবাকে জিজ্ঞেস করে—"দেখেছো নাকি ফটোটা—পাচ্ছে না আলপনা। বেচারীর সাধে ফটোটা।"

শেষ পর্যন্ত বললো, "বোধ হয় মেজদা লুকিয়ে নিয়েছে—পছন্দ হয়েছে—এমনিতে হয়তো লজ্জা পেয়েছে। আর তোকে যেরকম ভালবাসে তাতে ও ছাড়া আর কেউ নেয় নি।"

আলপনা তো সুনন্দার বলবার ঢং দেখে ততক্ষণে ওপরে যাবার সিঁড়ি বেয়ে পালাচ্ছে। ছি ছি, কি লজ্জা! তারপর আড়ালে বলে সুনন্দাকে—"তুই এত অসভ্য কেন রে?"

—"কি হলো!" ভালমানুষের মত বলে সুনন্দা।

—"যাঃ আর ন্যাকামি করতে হবে না তোকে।"

অশোক কলেজ থেকে ফিরে ওপরে যাবার সিঁড়িতে সবে পা বাড়িয়েছে হঠাৎ সুনন্দার কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে—"ও মেজদা, আলপনার ফটোটা দিয়ে দাও ও বেচারী খুব কাহিল হয়ে পড়েছে ওটা হারিয়ে।"

—"কি বললি?"

—"কি আবার···ফটোটা দিয়ে দিতে বলছি।" তারপর স্বর নামিয়ে ঘরোয়া ভাবে বললো—"বেচারী সত্যিই কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে।"

—"যা-যা, বাজে বকিস্ না—আমি নিয়েছি কে বললে তোকে?"

—"অন্য একটা তোমায় দেবে বলেছে।"

—"আমি নিতে যাবো কেন—" গম্ভীর হয়েই বলছিল অশোক কিন্তু সুনন্দার বলবার ঢঙে হেসে ফেলেছিল হয়তো একটু।

—"আমি যে দেখলাম···হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই নিয়েছো···ঐ যে তুমি হাসছো।"

—"হেসেছি তাই নিয়েছি·····" অশোক আর দাঁড়ায় না। ওর ঘরে ঢুকে বইখাতা রেখে সোজা আলপনার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—"ব্যাপার কি আলপনা! তোমার ফটো আমি নিয়েছি, হঠাৎ এ সন্দেহ কেন?"

—"আমি সন্দেহ করি নি। সুনন্দাই বলছিল যে আপনি নাকি নিয়েছেন।"

—"মহা ফাজিল হয়েছে মেয়েটা—যাকগে কিন্তু সত্যিই আমি নিই নি কাজেই নিয়েছি ভেবে ভুল বুঝো না। আর নেবার তেমন প্রয়োজন হলে তো চেয়েই নিতাম। শেষের কথাটা একটু জোরে এবং ঈষৎ ঠোঁটবাঁকানো ভাঙ্গিতে বলে বেরিয়ে যায় অশোক।

তবু বাঁকানো ঠোঁটের কোণে এক ঝলক চোরাহাসি আলপনার চোখ এড়ায় না। ও-ও হাসি চাপতে পারে নি হেসেওছিল, তবে চোখে। আলপনা খুশিই হলো ভেবে। ওটুকু হাসি কি আর ও বোঝে না—এতই কাঁচা মেয়ে! তবে চেয়ে নিলেই হতো—ও কি আর দিত না। এখন জো পেয়ে সুনন্দা তো পেছনে লাগবেই।

এর পর সুনন্দা যেভাবে অশোকের পেছনে লাগল তাতে ওর বাড়ি টেঁকাই দায় হয়ে দাঁড়াল। যখন-তখন মা-বাবার সামনে বলত—"জানো মা, মেজদাই নিয়েছে ফটোটা।" এইগুলো ভারী বিশ্রী লাগতো আলপনার।

শেষ পর্যন্ত অশোকের করুণ অবস্থা দেখে আলপনাই বললো একদিন—"ছাখ, তুই যদি এরকম করবি তা হলে আমি কিন্তু থাকব না বলে দিচ্ছি।"

—"ওঃ, ভারী ইয়ে দেখছি!"

এর পর আলপনা আর সত্যিই বেশিদিন থাকে নি ওখানে। অশোকও প্রায়ই এড়িয়ে এড়িয়ে বাইরে বাইরে বেড়াত সুনন্দার অত্যাচারে।

যাই হোক, ফটোটা নিয়ে উচ্চবাচ্য আর করে নি আলপনা। তার ফটো অপাত্রে পড়ে নি—মনের এই-ই বোধ হয় গোপন ইচ্ছে ছিল ওর—তাই তা এভাবে পূরণ হতে দেখে আলপনা ওই প্রসঙ্গে ছেদ টানল।

চিঠিটা শেষ পর্যন্ত ওর পড়া উচিত ছিল—ভাবল আলপনা। আর নরেনের মৃত্যুসংবাদটাই নিশ্চয়ই সবটা নয়। অশোকদার পাশ করার খবরও তো থাকবার কথা চিঠিটাতে। এবার আলপনার বুঝতে আর বাকি থাকে না। নিশ্চয়ই ছোট্ট করে লিখেছে ভাঁজের মধ্যেকার পিঠে। সুনন্দা যা মেয়ে! যাক, এবার মোক্ষম হার মানতে হলো ওকে সুনন্দার কাছে।

ওর আর তর সয় না। বাড়িতে ঢুকে বইখাতা রেখেই চিঠিটা তুলে নেয় টেবিলের তলা থেকে। ছোট্ট চিঠি। ভাঁজ খুলে উলটেপালটে দেখল। কিন্তু... যাই হোক, চিঠিটা শেষ করে বুঝল নরেনের মৃত্যুসংবাদ নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেয় নি সুনন্দা। এটুকু তো আগেই বোঝা উচিত ছিল আলপনার যে নরেনের মৃত্যু একটা জানানোর মত ঘটনাই নয় সুনন্দার কাছে। নরেনের সঙ্গে ওর যেরকম ব্যবহার দেখে এসেছিল আলপনা তাতে নরেনের মৃত্যু আর পথের একটা কুকুরের মৃত্যু প্রায় সমজাতের সুনন্দার কাছে! সেই সুনন্দার পক্ষে কি এতটা সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক! আলপনা ভুল করেছিল।

শেষ দুটো লাইনের ওপর আবার চোখ বুলোয় আলপনা—"তোর সেই ফটোটা

পাওয়া গেছে নরেনের বাক্সে। ও বাঁধিয়ে রেখেছিল ওটি। পাঠিয়ে দেব নাকি জানাস।"...

ঠোঁটটা দাঁতে চেপে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াল আলপনা। চিঠি আসার পর থেকে সারাদিনের বিচিত্র ভাবনা-জড়ান মনটার কথা মনে করতে চেষ্টা করল আবার। পারল না। খোলা জানলা দিয়ে চোখকে ও বাইরে ছড়িয়ে দিল, সঙ্গে মনকেও। মৌমাছি উড়ে যাওয়া একটা চাকের মত নিজেকে মনে হচ্ছিল আলপনার।

দু'দণ্ডের অপেক্ষায় ॥ উৎপলকুমার বসু

শেষ হলো মেঘের সঞ্চিত জল।
মাঠে মাঠে এখনো চঞ্চল
দু'একটি জলের ছোটো ক্ষণিক পৃথিবী।
জানো, কোন শূন্যতার থেকে
ফিরে এলো প্রেমিকযুগল ?
সিক্ত মেঘ দেখেছিলো ঐ ঘন বনের আড়ালে
দুজনার সমুখে দুজন।
অদূরের যত বন
আবার বৃষ্টিতে যদি ঢেকে যায়
তুমি ভাবো ওপারেই শূন্যলোক
তুমি ভাবো তারা কেন শূন্যতার অভিমুখী।

মন এবং রাতের ট্রেন ॥ মলয়শংকর দাশগুপ্ত

অথচ কী আশ্চর্য সমস্ত পৃথিবীটা ঘুমিয়ে পড়বার পরেও
নিজেকে নির্জন মনে করে রাতের ট্রেনটার অপেক্ষায়
কি কারণ জানি না, জেগে ছিলাম।

প্ল্যাটফর্মটার অদূরেই টিম্‌টিমে আলোর একফালি—
অসীম করুণায় ঝুঁকে পড়েছে ইস্পাতের ছুটে চলা
লাইন দুটোর কোণ বরাবর ;
একান্ত অন্ধকারের মধ্যে কতগুলি তারা যেন
এদিকেই ঝুঁকে পড়েছিল ;
জানালাটার এক পাল্লা সরাতেই মনে হলো
ওরাও যেন গুটিগুটি পায়ে এদিকে আসতে পারে।

কেবলমাত্র ও-পাশের হোম্‌ সিগনালের লালবাতিটা যেন
কিসের একটা ধমক দিচ্ছে একপায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ;
নিঃসঙ্কোচ ঝিঁঝিঁপোকাগুলি
কির্‌-ই-ই ডাকে কালো বেড়ালের মতো ওতপাতা রাতের বুকে
একটানা লঘুতান ধরে চলেছে।
তারপর
অতিক্রান্ত মুহূর্তের শেষে পায়ের স্পন্দনটা
বাড়াতে বাড়াতে বা-ড়া-তে
দূরের মাঠটা পেরিয়ে
যেন ভূত দেখার মতো ভয়ে ছুটতে ছুটতে ছুটতে
অথবা যেমনি করে সমুদ্রে নদীতে ঝড় ওঠে
আথালপাথাল ঢেউয়ে দলছাড়া হয়ে
একচক্ষু আলোর তীব্র বর্শা ছুঁড়তে ছুঁড়তে

মন এবং রাতের ট্রেন

যেন কোনো একটা কুমির
আক্রোশে ভেঙে পড়তে চাইছে অন্ধকার রাতের গোপন গহ্বরে ;
মনে হচ্ছে অন্ধকার রাত্রি আর সমুদ্রনদীর চক্রান্তে
তার আপনপ্রিয় মুগ্ধবতীকে হয়তো কেউ লুকিয়ে রেখেছে,
হয়তো এই অন্ধকারে, হয়তো বা ;

যেন নতুন কোনো ভূমিকম্পের ভূমিকাতে সচকিত হয়ে
ঘুমন্ত গাছেরা কেঁপে কেঁপে উঠলো ;
দিগন্তবিস্তৃত কালো চাদরের ওপর দিয়ে
দু'পাশের দাঁতে আগুন ঝরাতে ঝরাতে
পাগলের মতন কীসের অদম্য আগ্রহে
কোথায় যেন এগিয়ে চলেছে,

একচক্ষু আলোর তীব্র বর্শা অন্ধকারে আছাড় খেয়ে
পড়তে না পড়তে কিসের যেন আর্তনাদ
ইথারে ইথারে শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ আনলো ঃ

হঠাৎ দুঃস্বপ্নে পাশ ফিরে শোবার মতো
কী এক আবেশে জানালাটা বন্ধ করে
দিতে না দিতেই
ঝম্ ঝম্ করতে করতে কুমিরটা উল্কার মতন
নাতিদীর্ঘ ব্রীজটা পার হয়ে গেল।

তারপর, হারিকেনটার দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম
আমি ॥

অন্ধকারে ঃ রজনীগন্ধার সন্ধানে ॥ সত্যধন ঘোষাল

(পৃথিবী-কে)

গতীয় বেলা বাড়তে বাড়তে
কখন যে বিস্ফোরণের কক্ষে পড়লো
আমরা তা টের পেলাম না
অনেক পথ কেটে কেটে গর্তে পা পড়বে
এমন সময় চকিত দৃষ্টি লাফ দিয়ে উঠলো

তখন খ-সূর্যের প্রাখর্যে খাঁখাঁ করছে প্রান্তর

হাই তুলে একটা বাজ পূর্বাভিমুখে ধেয়ে গেল ॥

আরও হাঁটতে অপারগ আমরা এখন বসলাম
তিনমাথা এক করলাম
অশথের ললিত ছায়ায়,
নোনতা বাতাসেরা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো
প্রিয়জনের অপ্রিয়তার মত
সংশয়ভাবনাগুলি ঘামতে ঘামতে ফিসফিস কথা হয়ে
পাতাগুলির মত ঝরতে থাকলো,
না। ভয়ে আমরা হয়ে উঠছিনে শশব্যস্ত ॥

কাজের মাঝে আমরা যা চেয়েছি
হয়তো বৈশাখের বিবিক্ত প্রান্তরে ঝলসে ঝলসে তা পেয়েছি
বা পাইনি
আবার পরস্পর পরস্পরকে আপনজন ভেবেছি আর তাই
আমাদের চলার মূলধন
মুষ্টিমেয় কজন যে নিজেদের চিনেছি
এই আশ্চর্য !

এবং চেয়ে পেতে বা না পেয়ে চাইতে চাইতে
মন্থর বিবেচনায় সূচনা করেছি পার্থিব এষণা,
জঙ্গলে জঙ্গলে কর্ষিত হতে হতে
পরিষ্কারে পরিণত করেছি পচাপুকুরের পরাজয়
ঘুচিয়েছি নদী বইয়ে
নোংরা ছেঁকে ছেঁকে
সম্পূর্ণ নিরাপদ না করতে পারলেও
একটা সুস্থ গতি এনেছি
আনছি
আনতে হবে ॥

চলতে চলতে থেমেছি থামতে থামতে চলিনি
অর্থাৎ স্বপ্ন এবং কাজ
ধারণা এবং সাফল্য।
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক ইতিহাসকে পেছনে রেখে
আমরা যে নির্বাচিত হয়েছি বিরচনায় আলোচনায়
তার পরিচয়
সর্বদাই আমাদের চেতনায় হার্পুনের মত বেঁধে ॥

ক্রমশ হাওয়া বন্ধ হয়ে আসে
ঝরাপাতার শব্দও শ্রুতিগোচর নয়
শুধু গমগম করছে কেন জানি অরণ্য।
আমরা সজাগ হই।
দেখতে দেখতে দিগন্তের রং কখন যে পাঙাশ হয়ে গেছে
শমিতও হয়ে পড়েছে অশনিতসায়ম্

ঝাঁকঝাঁক বাদুড় ঝুলতে ঝুলতে প্রতীচীমুখিন হলো।

অচিরাৎ অবতামসের আপতন ॥

আমরা যে যার দিকে তাকালাম
আস্তে আস্তে গাঝাড়া দিয়ে উঠলাম
চোখে চোখে মশাল জ্বলল
জ্বালালাম
পথ চিনতে,

বুঝলাম শুরুর সময়
বুঝলাম জগৎ একটা প্রশ্ন হয়েই বারবার থাকে
আর
ভাঁজ খুলতে খুলতে তৈরী জীবন তারই উত্তর ॥

প্রবাসে ॥ বাসুদেব গুপ্ত

বন্ধুদের খবর নেই,—
বিরাট শালে হাওয়া উঠছে ঝিরঝিরিয়ে,
ঘরের মাঝেই পা ফেলতে লাগছে ভয় ;
কি জানি হায় হঠাৎ যদি ছন্দোময়—
পথিক স্মৃতি আমার হিয়া যায় ভুলিয়ে।

বন্ধুদের খবর নেই,—
অল্প এই,
দিনগুলি মোর কোথায় যায় ?
শুকনো পাতা গাছের তলে ঝরছে তাই ;
হাওয়া বলছে ঝুলিতে মোর কিচ্ছু নাই—
শুকনো ফুলে রুক্ষ মাটি হাত বাড়ায় !

বন্ধুদের খবর নেই,—
উচ্চকিত কোকিল তবু ডাকছে যে ;

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে ইচ্ছে হয়।
মন বলছে তোমার স্মৃতি রাখছে কে,
ফুরিয়ে গেলে এক নিমেষে লুটবে ভয়॥

আমরা চম্‌কে উঠলাম ॥ কল্যাণাশিস্ দাশগুপ্ত

আমরা চম্‌কে উঠলাম—
যখন ঘরের আলো
হঠাৎ নিভে গেল,
আর সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে
একটা হাওয়ার ঝড়
বিকট শব্দে দরজার 'পরে
আছড়ে পড়ল।

নিঃসীম অন্ধকার আর, তারও চেয়ে
গভীর শূন্যতা আমাদের চারদিকে।
তখন হঠাৎ সে আমার হাতে হাত দিয়ে
নিশ্চিন্ত ভরসায় বসে রইল,
আমার মন পাওয়ার আনন্দে
নেচে উঠতে গিয়ে উঠল না,
পাওয়ার আনন্দ
অনন্ত নিঃসীমতায় হারিয়ে গেল॥

ধূসর চেতনা ॥ প্রদীপ মৈত্র

বিকেলের গন্ধ হলুদ রোদ্দুরে ভেসে এলে
লোভী ধূসরতা পাখা মেলে আসে
দূরতর দ্বীপ হতে নির্জন ছাদ আর আলসেতে
রুগ্ন পাখিদের উৎসব শুরু হয় ভিজে নদীতে,
জলতরঙ্গের সুর বাজে তার চোখে,
সে এসে আমাকে ছড়ায়
আকাশের লাজুক তারায় তারায়।

যে মন আলেয়া হয়ে নির্জন আঁধারে
জীবনের পরিধি বিস্তারের আশায়
সারারাত খুঁজে ফিরে সৌর সম্ভাবনা,
অবশেষে ক্লান্ত হয় একখণ্ড মোমবাতির মত
গলে গিয়ে হতাশ ধোঁয়ায়,
যেন সেই ভোরে নিথর জলে ঢেউ তুলে
উড়ে যাওয়া এক পাখির মত
সে মনকে ছুঁয়ে গিয়ে উচ্চকিত করে ;

আমার এ মন সোনালী পাখি হয়
সেই রক্তাভ ভোরে ॥

রূপরাগ ॥ কালীপদ রায়

জলদগ্নি মেঘ ছিল আকাশে তখন,
শ্যামল তমাল বন
ছিল নীচে : বাঁকা-বিদ্যুৎ-আঁকা
দুর্যোগের মেদুর অম্বরে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি,
দূর দিগন্তরে ভাসমান ক'টি শ্বেত আকাশকুসুম।

মনে হলো, যেন এই পৃথিবীর থেকে
কে যেন দিয়েছে ছুঁড়ে এক গুচ্ছ কাশফুল
আকাশের মেঘনার দিকে!
সহসা সে-ফুলগুলি পেয়ে গেল দুঃসাহসী পাখা—
ঝঞ্ঝার বিলাসে মত্ত হলো তারা এক ঝাঁক
ব্যাকুল বলাকা।

এতদিন দেখেছি তাদের সুশান্ত জীবন
সীমায়িত পৃথিবীর বিটপীর শাখে আর
তটিনীর বাঁকে,
আজ তারা পেল যেন আকাশের স্বাদ
ওই বজ্রের আলোকে।

আর কোন নদীচর নয়
নয় কোন সমুদ্রসৈকত,
ঝড়ের আবেগমত্ত তাহাদের পাখা
পেতে চায় বুঝি কোন্ মেঘাতীত রূপের জগৎ।

ক্ষণকাল-দিয়ে-গড়া ওই মহাকাল
মাঝে মাঝে খুলে দেয় অপরূপ রূপের মহাল,

মহাশূন্যলোক খুলে দিয়েছিল বুঝি
সে-রূপের কঠিন নির্মোক,
যে-রূপের ছটা লেগে বলাকার ডানা
আকাশের মানে না সীমানা।
হৃদয়ে তাকিয়ে দেখি, সেই সুরে ঠিক
বাঁধা আছে মানুষের বিজ্ঞানের বীণা।

আমি ॥ প্রেমেন্দু বসু

তথাপি আমার চোখে আমিত্বের প্রাঞ্জলতা নেই
দুর্বোধ্য সেই
আমার আমিরে খুঁজে খুঁজে
নিঃসঙ্গ, অতল কোণে হৃদয়ের নীলাভ সবুজে—
মনের প্রবালদ্বীপে, মননের বৃত্তে ঠিকানা,
তবুও অগম্য মন চিরন্তন, আদিম অজানা।

অথচ আমার মন লজ্জারুণ বধূর মতন,
একান্তই গহন, গোপন ;
নিজেরে ঢেকেই আছে অর্থহীন ব্যর্থ অহংকারে
তবু বারে বারে
সোনালী স্বপন ভরা এ মনের মৃগতৃষ্ণিকার
—চক্রবালে ইন্দ্রধনু জাগে
সপ্তরং গোধূলিতে স্বপ্নালি ছড়ায়
জীবনের অসংখ্য পরাগে।

চেতনের অন্ধকারে মনের চৌকাঠ দিয়ে ফাঁকি
কবেই সে দেবে পাড়ি সে আশায় পথ চেয়ে থাকি!

ইছামতী ॥ প্রশান্ত ধর

ইচ্ছামতী মিষ্টি মেয়ে নিঝুম দুপুরে,
ছল্ ছল্ ছল্ মন ভরালো সুরের নূপুরে
ওপারে ওই হৃদয় ছুঁয়ে শুভ্র কাশের বন,
দখিন হাওয়ার সোহাগ পেয়ে উদাস উন্মন।
সারাটি রাত মলয় সোহাগ উথ্‌লানো দুধ শাড়ি,
মিষ্টি মেয়ের দেহের থেকে হাওয়ার কাড়াকাড়ি।

ফাল্গুনে তার আবীররাঙা পলাশছাওয়া পাড়,
রঙের নেশায় রাঙিয়ে দিল সারাটি মন তার,
জ্যৈষ্ঠ মাসে গন্ধব্যাকুল মউল বউএর প্রাণ,
'মউ' 'মউ' 'মউ' খুশির আবেশ : বেলকুঁড়িরই ঘ্রাণ।

জোনাকজ্বলা স্তব্ধরাতে নিঝুম পলাশবুনি,
কান পেতে রই : আলতো হাওয়ায় চাপা কান্না শুনি।
কত যুগের অভিমানীর হরিণচোখের জলে,
ইচ্ছামতী মিষ্টি নদী হয়েছে টল্‌টলে।

কান্না ভেজা নীল খামে পাই তোমার চিঠি যদি,
বলতে পারি তুমিই ওগো, তুমিই আমার ইচ্ছামতী নদী ॥

মেয়েটির মুখ ॥ নির্মলকুমার রায়

মেয়েটির মুখ
জানি না সে কোন্
অন্ধকার গহ্বর বুকে
লুকায়িত পাথরের উর্বশীর মুখের নকল।
জানি না ও মুখের হাসি
মোনালিসার মায়াজাল কি না!
শুধু জানি, শুধু ভাবি
মেয়েটির মুখ
বরষার থমথমে মেঘের মতন:
মায়া আছে
আছে শান্ত সৌম্যতার রূপ।
মূক নয়—মৌন বেদনা ভরা
ম্লান হাসিখানি
মনে হয় যেন
দমকা বাতাসে নেভা
প্রদীপের জাফরানী শিখার সমান।
আলগোছা চুলে তার ঝড়ের ইশারা
কাঁপে শির্‌শির্
প্রান্তরের পান্না ঘাস যেন।
মাঝ দিয়ে ব'য়ে গেছে সীমন্ত নদী
তারি মোহানায় বিস্তৃত কপাল সাগর
নিয়ত সেথায় জ্বলে সূর্যের টিপ।

রামধনু রঙে আঁকা পৃথিবীর বুক
দেখি আর মনে হয় মেয়েটির মুখ ॥

কয়লা-তীর্থে ॥ নির্মলেন্দু দত্ত

আমরা আশুতোষ কলেজ নতুন ছাত্রাবাসের আবাসিক। এ পান্থশালায় আমরা দুদিনের জন্য এসেছি, এখানকার পালা শেষ হ'লে আবার চলে যাব 'অন্য কোথা' জীবনের আলোর সন্ধানে। এই গতিশীলতাই জীবনের ধর্ম, তার সার বস্তু। তবু মাঝে মাঝে এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন মনে হয়, জীবন যেন তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছে, সব কিছু যেন একেবারে থেমে গেছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথমে এমনি একটা অবসাদে আমাদের শরীর মন এলিয়ে পড়েছিল। গতানুগতিক জীবনের বৈচিত্র্যহীন ধূসরতা আমাদের মনের আকাশ আচ্ছন্ন করেছিল। এমন সময় খবর এলো, বড়দিনের ছুটিতে এবার ঝরিয়া যাওয়া হবে। এই আশা ও আনন্দের সংবাদে ছাত্রাবাসের জীবনে একটা সাড়া পড়ে গেল। বন্ধুদের কল-গুঞ্জনে আবাসভবন মুখরিত হ'ল। সুদূরের পিয়াসী মন আমাদের নতুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পুলকে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল কোন রূপকথার রাজ্য যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বাইশে ডিসেম্বর অতি ভোরে উঠে আমরা চল্লিশটি ছেলে সমস্ত পাড়া সচকিত ক'রে জিনিসপত্র বেঁধে খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা সওয়া নয়টার মধ্যে মাননীয় অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য এবং আরও ছ'জন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে শিয়ালদা ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হ'লাম। উৎসব শেষে পরিত্যক্ত দীপহীন নিস্তব্ধ নাট্যশালার মত আমাদের আবাসগৃহটি পিছনে পড়ে রইল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে অপেক্ষমান যাত্রীদের কলরবের মধ্যে আমরা যখন আট নম্বর প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করলাম, তখন ষ্টেশনটি উচ্চকিত হ'য়ে উঠল। অনেকেরই কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ল আমাদের উপর। কিন্তু দিল্লী এক্সপ্রেসের জন্য প্ল্যাটফরমে যাত্রীর

ভীড় এত বেশি যে তাদের সেই খণ্ড খণ্ড বিচিত্র কোলাহলের সমগ্রতার মধ্যে আমাদের উৎসাহদীপ্ত চঞ্চল কণ্ঠ কোথায় তলিয়ে গেল।

ট্রেন এলো—রিজার্ভ করা কামরায় উঠে সবাই তখন মনোমত জায়গা ক'রে নিতে তৎপর। তারপর এতগুলি আনন্দ-উচ্ছল প্রাণ নিয়ে তার যাত্রা শুরু হ'ল। বিহারের সেই কয়লাকুঠি সমাকীর্ণ প্রান্তর অভিমুখে আমাদের আনন্দ অভিযান। কত কি দেখবো!...'হিউমার্গ অব কোল'-এর পরিবেশ ও চরিত্রগুলোকে প্রত্যক্ষ করবো,... শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি'-র কাহিনীর পরিবেশে যা ছিল এতদিন রঙিন, তা আজ বাস্তব মূর্তি ধরে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হবে। সিন্ধ্রীর সেই বিশ্বখ্যাত সারোৎপাদন কারখানাকে এতদিন কল্পনা দিয়ে গড়েছি, তা আজ দেখবো নিজেদের এই দুটো চোখ দিয়ে। আনন্দ ও উত্তেজনায় মনটা তোলপাড় করছে। এভাবে নানাকথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। অন্য বন্ধুরা কি ভাবছিল জানি না। তবু তাদের মনও যে এই অজানার আহ্বানে সাড়া দেয় নি তা মনে হয় না। যত হৈ-হল্লা আনন্দ উল্লাসের মধ্যেই তারা মেতে থাকুক না কেন, হয়তো কোন এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতার অবকাশে তাদের মনেও এ ভাবনা দোলা জাগিয়েছে। দুরন্ত বেগে ছুটে চলা গাড়ীর জানালা গলিয়ে যারা তাকিয়েছিল আদিগন্তবিসারী প্রান্তরের দিকে, তারাও, কি রূপে ধরা দেবে সেই অজানা অচেনা, তা না ভেবে পারে নি। কখনো বা হাসি-ঠাট্টা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝকমকে ধারালো চকমকি, কখনো বা একটু গরম কথা-চালাচালির উষ্ণ হল্‌কা উঠছিল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, তবুও প্রাণে একটা দুর্দান্ত চাঞ্চল্য অনুভব করছিলাম। হোষ্টেলে যাদের নিতান্ত শান্ত ও নিরীহ বলে জানি তাদের মধ্যেও যেন এতদিনকার চাপাপড়া প্রাণের আবেগ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গাড়ীর গতিবেগের সঙ্গেই সমানতালে ছুটে চলেছে। এ যেন মুক্তিপিয়াসী তরুণচিত্তের উদ্দাম উদ্বেল আনন্দ উচ্ছ্বাস। এ যেন পাষাণকারায় বদ্ধ জলরাশির হঠাৎ প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে পড়া মুক্তধারা,— এ যেন জীবন-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

গতিবেগ মন্দীভূত করে বিরাট দানব এসে থামলো বর্ধমানে। শিয়ালদা থেকে পুরো দুঘণ্টা প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে যেন ক্লান্ত দানব একটুখানি বিশ্রামের নিশ্বাস ফেলে তার আকণ্ঠ পিপাসা মেটাতে বসলো। ইঞ্জিনটা হুস্ ক'রে গাড়ী থেকে কেটে বেরিয়ে গেল যেন ঐ জলন্ত তৃষ্ণা মেটাতে। তারপর আবার এসে লাগলো বগীগুলোতে। ইতিমধ্যে বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা দেখে বন্ধুদের অনেকেরই খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ কিছু খেলেনও। গাড়ী ছাড়বে—সবুজ পতাকা দুলছে ওদিকে গার্ডের হাতে—সমস্ত শরীরটা একটু দুলিয়ে কাঁপিয়ে আবার ছুটলো গাড়ী। আস্তে আস্তে দুর্গাপুর এলো—চোখ বাড়িয়ে সকলেই দেখলো দূরের ব্লাষ্ট

ফার্নেসের গগনচুম্বী ঔদ্ধত্য। এলো অণ্ডাল, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বরাকর। পথে কুলটি কুমারডুবীর কারখানাও দেখলাম সাগ্রহে মুখ বাড়িয়ে। এরপরই ধানবাদ ষ্টেশন। সবার মন এবার আবার নতুন এক উদ্দীপনায় নেচে উঠলো। ধানবাদের প্লাটফরমে গাড়ী ঢুকতেই অপেক্ষমাণ যাত্রীর ভীড়ের মধ্যে বন্ধুবর শতদ্রুশোভনের চেনা মুখখানা দেখে সকলেই উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলো। নামলাম একের পর এক, শীতের ঘনায়মান গোধূলি লগ্নে।

সারা দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ করা রোদের মধ্যে এতটা পথ ছুটে এসেছি সবাই। সবারই মুখে শুষ্ক এক ক্লান্তির ছাপ। অবিন্যস্ত চুলগুলি কয়লার গুঁড়োয় বোঝাই,—হাওয়ায় উড়ছে। সবাই নেমেছেন—অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, অধ্যাপক শিশির দাস, অধ্যাপক কান্তিশ মাইতি, অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দে এঁরাও নেমে দাঁড়িয়েছেন।

আমরা যাঁর অতিথি হব সেই কয়লাখনির মালিক শ্রীঅর্জুন আগরওয়ালা তাঁর সেক্রেটারী ও চীফ সার্ভেয়ার সবাই এসেছেন আমাদের স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যেতে। অর্জুনবাবু অতবড় শিল্পপতি হ'লেও তাঁর স্মিত প্রৌঢ় গাম্ভীর্য এবং পোশাকের সহজ সারল্য সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। অধীক্ষক ও অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁদের সবার পরিচয় বিনিময় হবার পর একটি রিজার্ভ করা বাসে আমরা চললাম কয়লাতীর্থ ঝরিয়ায়। আকাশে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশী ; ম্লান জ্যোছনায় কুহেলিকাচ্ছন্ন পৃথিবীতে একটা মায়ালোকের সৃষ্টি হয়েছে। তারি মধ্য দিয়ে আমাদের বাসখানি যখন বেগে ছুটে যাচ্ছে তখন চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা যেন একটা রহস্যের অন্তস্তলে ডুবে যাচ্ছি। ঝরিয়ায় 'বিহার' চিত্রাগার ও 'রাজবাঁধ'-এর সামনে আনন্দ-ভবনের দোতলায় আমরা আশ্রয় পেলাম। সেদিনকার পথশ্রান্তিতে সবাই যেন একটু নির্জীব হ'য়ে পড়েছেন। অনেকেই গদী বিছানো বিরাট ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঝরিয়ার হাড় কাঁপানো শীতে কেউ কেউ একটু কাবু হ'লেন। তবে রক্তের কাছে সবই উপেক্ষণীয়।

পাশেই রাঁচী হোটেলে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। খাওয়ার উপকরণের মধ্যে ছিল ভাত ডাল মাংস বা মাছ আর চাটনী। এ খাদ্য অনেকেরই ভাল রোচে নি। ঝাল ও লবণের আধিক্য সকলের রসনার পক্ষেই পীড়াদায়ক হয়েছিল। তবে শীতের দীর্ঘ রাত্রি অঘোর ঘুমের মদিরতার মধ্যে কোন রকমে কেটে গেল।

পরদিন সকালকার রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া ও চায়ের টিফিন সেরে কিছু কিছু ফটো তুলে রোদ পুইয়ে শ্রীযুক্ত আগরওয়ালার তিনখানি গাড়ী ক'রে বেরিয়ে পড়লাম

কয়লাখনি দেখতে। অর্জুনবাবু নিজেও সঙ্গ দান করলেন আমাদের। ওঁর গো
কোলিয়ারীতে গিয়ে পৌছলাম। ঝরিয়া থেকে মাইল সাতেক দূরে জায়গাটি
কয়েকটি দলে ভাগ হ'য়ে গেলাম আমরা। শ্রীআগরওয়ালা, কোলিয়ারী ম্যানেজ
ও সার্ভেয়ার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সব ব্যাপার। বীহাইভকো
আভন-এ হার্ডকোক তৈরীর প্রণালী—পরিত্যক্ত কয়লাখাদের সুড়ঙ্গপথ, মাটি
নীচেকার স্তরবিন্যাস, কয়লাস্তরের অবস্থিতি এইসব তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মা
মাঝে বিরাট গর্ত, ধ্বসে যাওয়া জায়গা আর তার এক পাশে সারিসারি ছুটো কা
সুড়ঙ্গ—যেন দানবের মুখবিবর। ওর মুখে যে খুঁটিগুলো ঠেকনার কাজ কর
ওগুলি যেন ঐ দানবের করাল দংষ্ট্রাপংক্তি। মাতা বসুধার বুকে যেন বিরাট বির
ক্ষত।—কোন নিষ্ঠুর কাপালিক যেন খাবলে খাবলে ধরিত্রীমাতার বুকের মাংস তু
নিয়ে গেছে।

তারপর ছুটো দল রেজিষ্টারে নাম লিখিয়ে নামলাম কয়লা খাদের ভিতরে
প্রায় আড়াইশো ফুট গভীর মাটির তলায় লিফটের খাঁচায় ক'রে নামছিলাম আম
প্রতিক্ষেপে ছ'জন ক'রে। হেডগিয়ারের চাকা ছুটো ঘুরছে আর বিরাট মো
লোহার দড়িতে বাঁধা একটা খাঁচা নেমে যাচ্ছে, আর একটা উঠে আসছে। নী
থেকে আসছে ঢং ঢং ক'রে সংকেত ঘণ্টাধ্বনি। বুকে কেমন যেন একটা কাঁপ
লাগিয়ে এক অশরীরী জগতের ইঙ্গিত দিয়ে যায় ও-ঘণ্টা। ঐ যে জগতে নাম
চলেছি না জানি জায়গাটা কি ধরনের। এইরকমই কেবল মনে হচ্ছিল আর ম
জাগছিল শঙ্কাশিহরণ। ওধারে আর একদল নামছিলো এই খাদেরই সিঁড়িমুখপ
ইনক্লাইনড্ গ্যালারী ধ'রে। জনা কুড়ি ছেলে আলো সম্বল ক'রে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলা
সারিবদ্ধভাবে। এগিয়ে আসতে আসতে সুড়ঙ্গ পথের আলোর রেখার ক্ষী
রেশও গেল মিলিয়ে। জমাট বাঁধা অন্ধকারই শুধু অনুভব করতে পারছি আ
পায়ের তলার উঁচু নীচু কয়লার চাঙাড়ি। এভাবেই এগিয়ে চলেছি। সেই পাতা
পুরীর অন্ধকারটাকে যখন উপলব্ধি করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন এক নতু
জগতে এসেছি যেখানে আলো নেই হাওয়া নেই···শুধু রাশিরাশি প্রস্তরীভূত জমাট
বাঁধা অন্ধকার। পৃথিবীর জঠরে কি দারুণ নীরবতা!

আলোর সাহায্যে দেখাশুনোর কাজে লেগে গেলাম। ঐ যে সুড়ঙ্গ পথ বে
আমরা এগিয়ে এলাম ওটা থেকেই সত্তর আশী বা একশো ফুট অন্তর অন্তর আরে
সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে ছু'পাশে। আবার সেগুলির বেলায়ও তাই। এইভাবে সম
কয়লাস্তরটা দশফুট চওড়া দশফুট খাড়াই ক'রে কেটে কেটে যাওয়া হয়েছে। এইভা
কাজ চলেছে ডেভেলপমেণ্ট প্ল্যান অনুযায়ী, তারপরে হবে ডিপিলারিং। বিলেতে

অবশ্য অন্য একটা পন্থা অবলম্বন করা হয়—সেই এ্যাডভান্সিং ও রিট্রিটিংপ্ল্যান অনুযায়ী মাত্র দুই ক্ষেপেই সব কয়লা কাটা হয়।

এগিয়ে চলেছি এভাবে। বিকট একটা আওয়াজ আসছে। খাদের সুড়ঙ্গের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ও-আওয়াজ যেন বিকটভাবে কানে বাজছিল। এটা পাম্পের শব্দ—খাদের জল উপরে তুলে ফেলা হয় এর সাহায্যে। কয়লাকাটা হচ্ছে, এরকম একটি ফুঁদের (face) মুখে এলাম এরপর। দাহ—গ্যাসহীন খাদ—তাই কেরোসিনের খোলা ছুটো তিনটে ভিবে কয়লার দেওয়ালে ঝুলিয়ে তিন চারজন শ্রমিক গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটছে। তাদের কালিমালিপ্ত ঘর্মাক্ত গায়ে ক্ষীণ আলোর রশ্মি এসে প'ড়ে অদ্ভুতভাবে চক্‌চক্ করছে। পুরো আট-ঘণ্টা ঐভাবে ওরা কাজ ক'রে টনখানেক কয়লা কাটে।

তারপর রীতিমত গায়ে, হাতে, পায়ে, জামায় কালির ছোপ নিয়ে আমরা উঠে এলাম উপরে—মাটির পৃথিবীর অফুরন্ত আলোয় হাওয়ায়। চোখটা হঠাৎ কেমন ঝলসেও গেল যেন। মনে হ'ল পৃথিবী কত সুন্দর···এখানে কত আলো, কত হাওয়া—কত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। অজুনবাবুকে লোকে আদর ক'রে বলে—কয়লা অঞ্চলের রাজা। তাই তাকে দেখে কেবলি মনে হচ্ছিলো রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার কথা। সেদিন কেবল ধানবাদের স্কুল অব মাইনস্ ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হ'ল না।

বিকেলে ঝরিয়া শহর পরিক্রমায় বেরুলাম। এত ছোট শহর অথচ এত দোকানপাট এত গাড়ীঘোড়া আর লোক যে ধারণা করা যায় না। শহরটিকে বড় অপরিচ্ছন্ন মনে হ'ল।

পরের দিন সকালে বাসে ক'রে তোপচাচির হ্রদ দেখতে রওনা হলাম। হ্রদটি পরেশনাথ পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। গুহ ক'রে ফাঁকা পীচের রাস্তা ধ'রে বাস ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে দু একটি ট্যাক্সি পাশ দিয়ে পেছনে কিংবা আগে বেরিয়ে যাচ্ছে হুস্ ক'রে। আর এই গতিবেগের মধ্যে কানে ভেসে আসছে বন্ধুর স্বরচিত গানের সুর। পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। অসংখ্য নাম না জানা

গাছ,···ঘনসবুজ লতাকুঞ্জের উপর অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে ; এ সবের উপ
সূর্যের আলো প'ড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। এক বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের কীর্তি এ
সুবৃহৎ হ্রদ থেকে ধানবাদ ও সারা কয়লাখনি অঞ্চলে জল সরবরাহ হ'য়ে থাকে
আমাদের কলকোলাহলে নিস্তব্ধ অরণ্যের ধ্যানভঙ্গ হ'ল। অসংখ্য সন্ত্রস্ত পাখী
আর্ত গুঞ্জন উপেক্ষা ক'রে আমরা হ্রদের তীরে বেড়িয়ে আনন্দের ঝোলা ভা
ক'রে নিলাম।

ফিরে এসে তাড়াতাড়ি সিন্ধ্রীর বিখ্যাত সারোৎপাদন কারখানা পরিদর্শ
চললাম। পথে 'ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট', 'ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি' পেরি
যেতে হ'ল। সিন্ধ্রী কারখানা দেখা অনুমতি সাপেক্ষ। কয়েকজন গাইড আমাদে
বাস সমেত নিয়ে ঢুকলেন কারখানার ভিতরে। মাঝে মাঝে নেমে নেমে দাঁড়াচ্ছিল
আর গাইডরা সব কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সিন্ধ্রীতে দৈনিক একহাজা
টন এ্যামোনিয়াম সালফেট্ তৈরী হয়—আর আটশো টন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট
ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লাগে সিমেণ্ট তৈরীর কাজে।

আবার অতিথিশালায় ফিরে এলাম। সর্বাঙ্গে ক্লান্তির জড়িমা—ঘরের মধ্যে
তরল হাস্যপরিহাস-মুখর আনন্দের পরিবেশ। রাত সাড়ে নয়টায় শ্রীআগরওয়াল
আমাদের সাথে সমবেত হলেন···বিদায়ী ধন্যবাদে আপ্যায়িত করলেন। আমাদে
তরফ থেকে গান আবৃত্তি করা হ'ল। অধীক্ষক মহাশয় নাতিদীর্ঘ এক ভাষণ
দিলেন শ্রীআগরওয়ালাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। এসবই টেপরেকর্ডিং ক'রে রাখলে
ভদ্রলোক। শোনালেনও আমাদের একবার বাজিয়ে। বাস্তবিক অনেক জায়গা
হোষ্টেল থেকে বেড়াতে গেছি কিন্তু এরকম সহৃদয়তা ও আপ্যায়ন কোথা
পাইনি।

পরের দিন ভোর সাড়ে চারটেতে উঠে তোড়জোড় ক'রে সওয়া ছটায় ধানবা
গোমো এক্সপ্রেস ধরবার জন্য রওয়ানা হলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। শ্রীআগরওয়ালা
বিদায়সূচক হস্তসঞ্চালন দেখে মনে হচ্ছিল যেন দু'হাতে মুঠোমুঠো আতিথ্য
সহৃদয়তার স্বর্ণরেণু ছড়াচ্ছেন উনি। ওঁর কথা ভুলবার নয়।

ফিরে এলাম অধীক্ষক ও অধ্যাপকদের সাথে নিজেদের ছাত্রাবাসে কত স্মৃতি
পাথেয় নিয়ে।

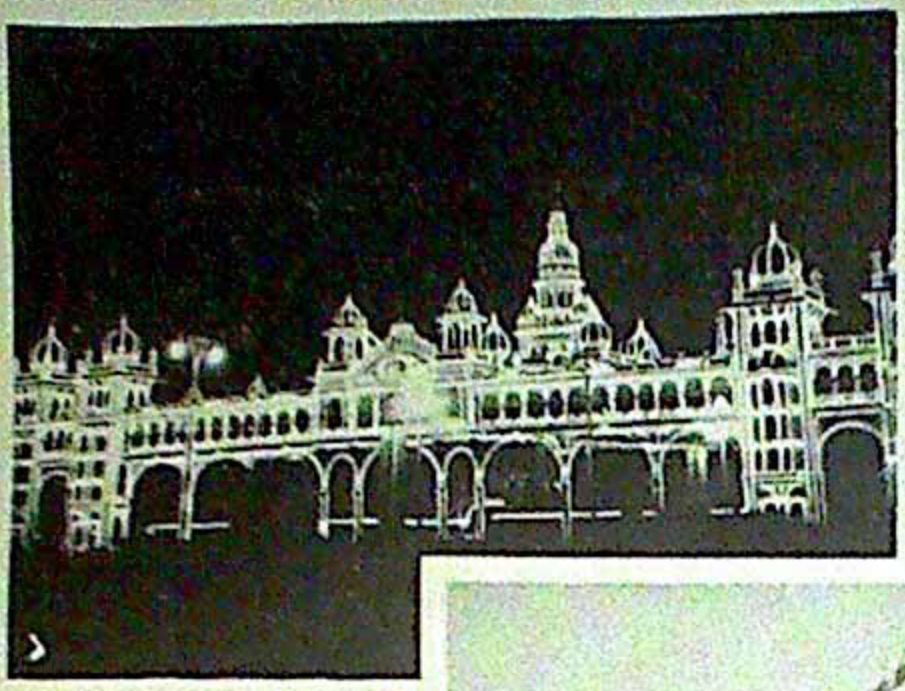

১ আলোকিত—বসন্ত মিত্র। ২ তাজ—উমেশচন্দ্র গুপ্ত। ৩ কুতব—প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়। ৪ আকাশ অনেক দূর—গ শ্যামরায়।

RABINDRA-PATHACHAKRA

SESSION 1957-1958

Sitting (from Left): H. Ghosh, T. Dhar, A. Bhattacharjee (G. S. Students' Union), Vice-Principal N. K. Bhattacharjee, Prof. S. Ganguly (President), K. Dasgupta (General Secretary), S. Chakravorty (Asst. General Secretary), S. Banerjee.

Standing 1st. Row (from Left): N. C. Seal, G. S. Ganguly, A. Ghosh, S. Kayal, B. K. Mukherjee, S. Banerjee, D. Chakravorty, P. Bose, T. Roy Chowdhury, A. Gupta (Jt. Lipika Editor), B. N. Haldar.

2nd. *Row* (from Left): B. Roy, S. Sen, S. Sur, K. Da[illegible]

তাম্রলিপ্তে একদিন ॥ দুর্গাশঙ্কর পাণ্ডা

অবশেষে দিন স্থির হ'ল। ৩রা জুন আমরা যাত্রা করলাম ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত তাম্রলিপ্তের উদ্দেশ্যে। প্রাচীন কালে এই তাম্রলিপ্তই ছিল সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম বন্দর। রাজা হর্ষবর্ধনের আমলে হুয়েনথ্ সাঙ নামক বিখ্যাত চীনদেশীয় পর্যটক ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বই লেখেন। এই বইএর একস্থানে তিনি লিখেছেন, তাম্রলিপ্তই বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষার প্রধান বন্দর।

আমরা ৩রা জুন সকাল ছয়টায় হাওড়া ষ্টেশন হ'তে খড়্গপুরগামী একটি ট্রেনে ওঠে বসলাম। ট্রেন চলতে শুরু করল, ধীরে ধীরে প্রাসাদপুরীর সমস্ত চিহ্ন মুছে গেল, ভেসে উঠল পল্লী বাংলার অনবদ্য শ্যামশ্রী। ট্রেন লাইনের উভয় পাশে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করছে, যেন রুক্ষতার মরুপ্রান্তর। আবার কোথাও বা শ্যামল বনানী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতির এই মোহন শোভা দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌছলাম কোলাঘাট ষ্টেশনে। কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত বিরাট এক বাণিজ্য কেন্দ্র। ছোট্ট শহর হ'লে কি হবে বেশ সাজান গুছান। ট্রেন যাতায়াতের জন্য রূপনারায়ণের উপর বিরাট এক ব্রিজ। এই ব্রিজই কলকাতা ও বোম্বাই এই দুই মহানগরীর মধ্যে যোগাযোগের প্রধান সূত্র। কোলাঘাটের পর আর মাত্র দুটো ষ্টেশন তার পর আমাদের নামতে হ'ল পাঁশকুড়া ষ্টেশনে। এখান হ'তে বাসে করে যেতে হবে প্রাচীন তাম্রলিপ্তে। আমরা যে যার বিছানাপত্র বেঁধে বাসের উপর চাপিয়ে দিলাম। বাস চলতে শুরু করল।

রাস্তার দু-ধারে শাল ও সেগুন গাছের ভীড়, মাঝে মাঝে আম, জাম, জারুল গাছও দেখা যায়। সোজা পীচের রাস্তা, মাঝে মাঝে এক আধটা বাঁক তারপর আবার সোজা রাস্তা চলেছে তাম্রলিপ্তের উদ্দেশে। দূর হ'তে দেখা যায় ছোট ছোট কুটীরের সারি, আবার কোথাও ফাঁকা মাঠ। দল বেঁধে কৃষক বালকেরা চলেছে মাঠে গরু চরাতে। গ্রামের এই শান্ত পরিবেশ শহরবাসীর মনে দোলা দেয়। বেলা দশটা নাগাদ আমরা পৌছলাম তাম্রলিপ্তে।

আগে থেকেই একটি হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা ছিল। বিরাট হোটেল নাম 'প্যারাডাইস'। পরে শুনলাম টাউনের বিখ্যাত হোটেলগুলোর মধ্যে এটাও একটা। তাড়াতাড়ি করে স্নান সেরে নিলাম। খাওয়ার পাটও চুকে গেল, বেরিয়ে পড়লাম ক্যামেরা নিয়ে বেড়াতে। রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত এই

গিরিডি ॥ শ্রীদিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

গত পূজার অবকাশে ভূগোল বিভাগ থেকে আমরা পনর জন সতীর্থ গিয়েছিলা বাংলা-বিহার সীমান্তের সহর গিরিডিতে ; সান্নিধ্য পেয়েছিলাম অধ্যাপক বিদ্যু ব্যানার্জী ও অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তীর। ছাপার হরফে লেখা বিষয়গুলির সাথে বাস্তবের কতটা সংযোগ তা যাচাই করে নেওয়ার জন্য ভূগোল ও ভূতত্ত্বের ছাত্রদের এরকম বার্ষিক ভ্রমণ শিক্ষার একটা অঙ্গ।

প্রান্তরের রহস্যময় নিস্তব্ধতা আর অমাবস্যা রাতের ঘনতমিস্রা ভেদ করে লৌহদানব ছুটে চলেছে—চারিদিকে নিশুতিরাতের জমাটবাঁধা অন্ধকার, কেবল জানালার ফাঁকে ফাঁকে বিজলী বাতিগুলো তাদের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে উঁকি মেরে আবার ঐ অন্ধকারেই হারিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সাথে যেন লুকোচুরি খেলা করছে এমনিভাবে পেরিয়ে গেল বহু ষ্টেশন। বাংলার শেষ সীমান্তও দিগন্তে মিশে গেল তখন ভোর হয় হয়, ট্রেন পৌছল মধুপুরে। যাত্রী ও কুলিদের কোলাহলে চঞ্চল হ'য়ে উঠল ছোট্ট ষ্টেশনটি। এখান থেকে ট্রেন বদল করে গিরিডি যেতে হয়। ষ্টেশনে নেমে আমরা প্রাতরাশ শেষ করলাম। দূরে পাহাড়ের ধারে ধারে তরুশ্রেণীর পল্লবান্তরালে প্রভাতী সূর্যের রাঙ্গা আভা জানাল সাদর সম্ভাষণ।

গাড়ী ছাড়ল প্রায় ৮টায়। পথের দুপাশে উপত্যকার পারে দিকচক্রবাল পর্যন্ত তরঙ্গায়িত গিরিশ্রেণী দেখা দিল—যেন "মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে"। তারই গা কেটে ধাপে ধাপে তৈরী কৃষিক্ষেত্র ; ইংরেজীতে একে বলে, 'Terraced cultivation.' চতুর্দিকে নজরে পড়ে যত সব ভুঁইফোড় নাম-না-জানা পাথরের বড় বড় চাঁই (ভূবিদ্যায় যাকে বলে 'Intrusion')। নরম মাটিতে যেখানে গাছ শিকড় গাড়তে পারে না সেখানে প্রবল বর্ষণে নালার সৃষ্টি হয়ে একটা বিশেষ আকৃতি হয়, তাকেই আমরা বলে থাকি 'Badlands'—তারও প্রচুর নিদর্শন রয়েছে পথের দুধারে।

যথাসময়ে ট্রেন গিরিডি পৌছল ; উজ্জ্বল সূর্যকিরণে অভ্রেণুমণ্ডিত মৃত্তিকা চিকচিক করে উঠল। পথের দুধারে অব্যবহার্য রজতশুভ্র অভ্রের স্তূপ গিরিডির খনিজ ঐশ্বর্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

টাঙ্গাগুলি যেন আমাদের পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। চড়ে বসলাম। ষ্টেশন ছেড়ে শহরের পথ বেয়ে ছুটে চলল ; খুব বেশী কর্মব্যস্ততা নজরে পড়ল না। ছোট্ট শহরও পেরিয়ে গাড়ী ধরল গ্রামের পথ। দুপাশে ইতস্তত মেটেবাড়ী, মাঝে মাঝে ঝাঁপ তুলে দোকানী পসরা সাজিয়েছে। অধিবাসীদের সাজ-পোশাকে বাহুল্য নেই,

আরম্ভ হ'ল। দলে দলে ভক্তবৃন্দ করযোড়ে দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন। সমবেত স্বরে ধ্বনিত হ'তে লাগল "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু···"। স্থান কাল পাত্র ভুলে আমরাও করযোড়ে দেবীর আরাধনায় যোগ দিলাম।

মন্দির হ'তে সামনের দিকে একটা লাল সুরকির পথ সোজা চলে গেছে শহরের বিজলী কেন্দ্রের দিকে, তারই একপাশে অবস্থিত বাংলার বিখ্যাত বহুমুখী বিদ্যালয় Hamilton Higher Multipurpose Secondary High School। ১৮৫২ সালে হামিল্টন সাহেব এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আজ শতাধিক বৎসর ধরে এই স্কুল নিজ ঐতিহ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বীর ক্ষুদিরাম এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত দেখালেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীও সাগ্রহে আমাদের নিকট ব্যক্ত করলেন। বেশীক্ষণ এখানে থাকবার সময় পেলাম না, স্থানীয় ক্লাবের আমন্ত্রণে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হ'ল।

শহরে ছোটবড় অনেকগুলি ক্লাব আছে। তারমধ্যে সংঘশ্রীও একটি। ওই ক্লাবের সম্পাদক শ্রীমুক্তিনাথ দাস মহাশয় আমাদের অভ্যর্থনা করে বিরাট এক হল-ঘরে এনে বসালেন। এটাই ক্লাবের মিলনী ক্ষেত্র। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সংবর্ধনা সভায় যোগ দিয়েছেন। একে আমরা কলকাতাবাসী তায় আবার আশুতোষ কলেজের ছাত্র, তাই অভ্যর্থনা কমিটির তৎপরতার সীমা নাই। নাচ, গান, বাজনার মাধ্যমে সমস্ত হলঘর মুখরিত হ'য়ে উঠল। বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। মুহূর্তে অনুভব করলাম আমরা যেন নিজেদের পাড়ায় নিজেদের মধ্যে গান-বাজনা করছি। এর পর এল বিদায়ের পালা। সংঘশ্রীর তরফ থেকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্গভীমার ফটো সংবলিত দুটি এলবাম্ আমাদের উপহার দেওয়া হ'ল।

রাত্রি দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। আবার বাঁধা-ছাঁদা শুরু করতে হ'ল। হোটেলের মালিক খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। জিনিসপত্র একে একে রিকশায় উঠান হ'ল। শুরু হ'ল আবার যাত্রা। শহরের মাঝ দিয়ে তিন তিনটে রিকশা ছুটে চলেছে শব্দ করতে করতে। ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রমক্লান্ত তাম্রলিপ্ত। লাইট-পোষ্টগুলি যেন রাত্রির প্রহরী। ধীরে ধীরে বাসে উঠে বসলাম সকলে। বাস চলতে শুরু করল ষ্টেশনের দিকে। মাত্র একদিনের অতিথি ছিলাম তাম্রলিপ্তে, তবুও যাওয়ার সময় মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। মনে হল যেন কত পরিচিত স্থান ছেড়ে আমরা চলেছি। নানা দৃশ্য ও স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল।

বাস এগিয়ে যেতে লাগল। পেছনে পড়ে রইল ঐতিহ্যময় তাম্রলিপ্ত।

দিক্‌চক্রবালে বনশ্রেণীর শ্যামলিমা নীল আকাশতলে গভীর ধ্যানে মগ্ন। প্রকৃতি সেই উদাস, স্বপ্নমুগ্ধ সৌন্দর্যের স্মৃতি আজও আমার মনকে বিবাগী করে দেয়।

দিনের শেষে নীচে নেমে এলাম, সাক্ষাৎ হ'লো সাঁওতালী মজুরদের সাথে। কি আর দেরী করা চলবে না—এবার পালাবদলের সময় হ'য়ে এসেছে; তাই ও ছেড়ে আবার ফিরতে হলো বাংলোতে।

পরের দিন জি. টি রোড ধরে আমাদের গাড়ী চলল "তোপচাঁচি জলাশ (Topchanchi Reservoir) অভিমুখে। পর্বতবেষ্টিত ধ্যানগম্ভীর তোপচাঁচি নিথর, নিস্পন্দ। তার জলে-স্থলে শুভ্রশান্তি বিরাজমান; মাঝে মাঝে যখন মধ্যাহ্নে রৌদ্রকিরণ নিস্তরঙ্গ প্রবাহের উপরে ঝিকমিক করে ওঠে, তখনও ওপারের বনের ছায়া অন্ধকার ঘনীভূত হয়। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বিরাট বাঁধ নির্মাণ করে রচনা ক হয়েছে এই মনোরম জলাশয়। মস্ত একটা কংক্রীটের ব্রীজ রক্ষা করছে দুপারের যোগসূত্র

এর পর আমরা গেলাম শহর হ'তে কয়েক মাইল দূরে উষ্ণ প্রপাতে। পথে দুধারে শালবীথি, তারই ফাঁকে ফাঁকে রোদ পড়ে আলোছায়ার আলপনা রচি হয়েছে। ট্রাকের শব্দে আশে পাশের গ্রাম্য বালক-বালিকা ঘর ছেড়ে তাদের অবাক চাহ নিয়ে পথে এসে দাঁড়ায়। দু'একটা বাঁক ঘুরেই শুনতে পেলাম অশ্রা কলধ্বনি, বিরাট গর্জন তুলে ফুলে ফুলে জলধারা আছড়ে পড়ছে নীচের পাথরের উপরে; তারপর আবার যেন সোনার কাঠির স্পর্শে শান্ত রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বরাকর নদীর দিকে। যেখান থেকে জলধারা পড়ছে সেখানটা দেখলে মনে হয় যেন পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তা সামনের দিক থেকে উঁচু করে রাখা হয়েছে কিন্তু সত্যিই তো তা নয়। প্রবল জলধারার অবিশ্রান্ত প্রবাহে পাথর ক্ষয় পেয়ে স্থানচ্যুত হয়, তারই ফলে ঐরূপ আকৃতি। যে পাথরটা শিথিল হয়ে যায় সেটাকে সে দূরে ফেলে দেয়,

ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড়; তাদের সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঘোড়ার ক্ষুরের একটানা খট্‌খট্ শব্দ আর সহিসের হুঁশিয়ারী মাঝে মাঝে কানে আসে। দূর থেকে দেখা গেল বিখ্যাত গৌরীপুরের জমিদারের "গুজিয়াডিহ্ বাংলো", আমাদের নির্দিষ্ট বাসভবন। ছোট্ট একটা পাহাড়ের গায়েই বাংলোটা, মাইলখানেক ঘিরে তার সীমানা নির্দেশক প্রাচীর। সেদিনটা বিশ্রাম নিতেই কেটে গেল।

পরদিন প্রত্যূষে রওনা হলাম পরেশনাথ পাহাড়ের (৪৪৮১ ফিট) উদ্দেশে। তরুশ্রেণীর ছায়ায় ঘেরা নিভৃত গ্রামগুলিকে পিছনে ফেলে, উঁচুনিচু, আঁকাবাঁকা হাজারীবাগ রোড ধ'রে গাড়ী ছুটে চলল সমুখপানে। কদাচিৎ মানুষের সাক্ষাৎ মেলে। পার্বত্য পথ স্থানে স্থানে চুলের কাঁটার মত সর্পিল। মাঝে মাঝে পথ উঠছে উপরের দিকে—পা শে ই অতলস্পর্শ খাদ। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম পরেশনাথের পাদদেশে, 'মধুবনে'। দু' তিনটি জৈন দিগম্বরের মন্দির রয়েছে দেখলাম। বিগ্রহের বেদীমূলে ধূপ-চন্দনের সুবাস আর শান্ত, সৌম্য, পবিত্র পরিবেশ স্থানটিকে মায়াময় করে রেখেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। সারা পথটাতেই টুকরো টুকরো পাথরের ছড়াছড়ি—কোনোটা গ্র্যানাইট, কোনোটা ফেলস্পার, আবার কোনটা কোয়ারজ্। তবে শেষেরটারই এ অঞ্চলে আধিক্য। বলা বাহুল্য, আমরা প্রত্যেকটারই নমুনা সংগ্রহ করে নিলাম। দু'ধারে শাল, মহুয়া, পলাশ ইত্যাদি ঘনপল্লবদলশোভিত বনস্পতির দল; মাঝে মাঝে অন্ধকার ঝোপের আড়ালে দু'একটা ঝরনা শেওলাধরা সাদা-কালো পাথরের গা বেয়ে কুলুকুলু শব্দে ঝরে পড়ছে। অজানা পাখীর কাকলী শুনে সেই বিশাল অরণ্যানী যেন মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। দূর হ'তে পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল, টুকরো টুকরো মেঘের ভেলা তার গা ঘেঁসে ভেসে চলেছে। ওখানে পৌঁছতে বিলম্ব হ'ল না। পাহাড়ের মাথায় মন্দিরে দশম জৈন তীর্থঙ্কর পরেশনাথের পদচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। শীতের প্রারম্ভে জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীরা এখানে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। আমার প্রসারিত দৃষ্টির সামনে প্রকৃতি তার অসীম ব্যাপ্তি নিয়ে প্রকাশ পেল।

গ্রন্থ সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া ॥ অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী। মূল্য : ৫'০০

সিদ্ধি সুদূরের, সাধনা আয়ত্তের ভিতর। ভুবন জুড়ে অশুচি কামনার তিমির। মহু কবি সেই অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন প্রেমের উজ্জ্বল দীপশিখায়। পশুজীবনেও টিঁকে থাক হলে প্রয়োজন পরস্পরের জন্য একটুখানি টান, আর ছিটেফোঁটা অনুরাগ। ঐ স্থূল, ঐ রূঢ় অনুর রসিকের হৃদয় ভরে না। বড় কবি তাই বিশ্বজোড়া প্রেমের উপাসক। মোহ পশুর, আর মু মানবাত্মার। কামনায় মরণ, আর ত্যাগাচ্ছাহ্নিনিরস্তরম্। খাঁটি প্রেম ভোগে নয়, ত্যাগে। প্রে চরিতার্থ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। কবি লিখতে গিয়েছিলেন, বাইরের ফরমাশ মত প্রেমের কবিত তাঁর হাতে ছিল রঙবেরঙের কাগজ। সে কাগজে খ'রে পড়েছিল তাঁর কল্পিন থেকে অমর বীজ সেই বীজ থেকে ফুটেছে মহুয়ার সহস্রদল। যার নাসা পাবে তার সুবাস, সেই করবে ভাবের লো নূতন ভুবন রচনা। সেখানে 'রূপের রেখায়' মিলবে 'রসের রেখা'। ভোগের কাঙালকে কবি কর চেয়েছিলেন শিল্পী। কবির কাছে বস্তু সত্য নয়, সত্য, স্বপ্ন ; সত্য, প্রেম। বস্তুতে বন্ধন স্বপ্নে মুক্তি। অধুনাতনটি সত্য নয়, সত্য চিরন্তন, তাই স্বপ্নের ধন। তার খোঁজ করতে হয় বাহি থেকে অন্তরে গিয়ে। মহুয়ার কবি বলেছেন দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা দেখে নিতে। কাছের প প্রিয়কে আড়াল করে, কেড়ে নেয় রসলোকরচনার আনন্দ। কাছে মোহের আঁধার, দূরে প্রেমে তরুণ তপন।

কবিগুরু করেছেন সৃষ্টি, আর কবি অমিয়রতন করেছেন তাঁর শিল্পসাধনার স্বরূপনির্দেশ কবির সাথী হ'য়ে তিনি করেছেন কবির সঙ্গে আনন্দলোকে বিহার। মহুয়া নামটি যে কবিগুর নিকট একটি অনির্বচনীয় আবির্ভাব, সে সত্যটি ধরা পড়েছে কবি অমিয়রতনের কাছে। 'মহু বসন্তেরই 'অনুচর' কবিগুরুর এইটুকু ইঙ্গিত, কবি অমিয়রতন ধীর অনুসরণ করে দেখতে পেয়েছে সুর্যোপাসিকা কল্যাণী বীরাঙ্গনাকে। তাঁর ব্যাখ্যায় কুয়াসা ভেদ ক'রে আলো ফুটেছে ; সে আলোত কাব্যখানি উঠেছে ঝলমল ক'রে। সৌন্দর্য যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁর দৃষ্টিকোণটি ধরা চাই। নইলে ব্যাখ্যা হয় না। অমিয়রতনের সাধনা আছে সে দৃষ্টিকোণটি ধরার, সৃষ্টির সে আনন্দ আস্বাদ করার আর আমার বিশ্বাস, আস্বাদই ব্যাখ্যা। অমিয়রতনের রবীন্দ্রকাব্যাস্বাদনের ধারা অনন্যসাধারণ তিনি কুড়িয়ে ধরেছেন, ছড়ানো সৌন্দর্য। আপাতত তুচ্ছের ভিতর তিনি সযত্নে আহরণ করেছে নূতন তথ্যের মণিমুক্তা। তাঁর উপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভার দেওয়া চলে রবীন্দ্রকাব্য মধু পরিবেশন করার মহুয়া গাঁজিয়ে তিনি মদ চোয়ান নি, আহরণ করেছেন মৃতসঞ্জীবনী।

অধ্যাপক সত্যকিংকর মুখোপাধ্যা

সেইজন্যই ত চতুর্দিকে অত পাথরের ছড়াছড়ি। এ প্রশ্নটা স্বভাবতঃই জাগে যে হঠাৎ এর গতির এরকম পরিবর্তন হয় কেন? অনেকে বলেছেন, মাটির অভ্যন্তরে অহরহ যে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে তারই ফলে হয়ত এক পাশটা উপরে উঠে গেছে (vertical uplift) বা যে পাশটা অনুপাতে নীচু সেটার অধঃপতন ঘটেছে (downthrow)। অধীত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করে, অপরিসীম আনন্দ নিয়ে আমরা ফিরে এলাম। পিছনে পড়ে রইল উশ্রী, তার নিঃসঙ্গ একাকিত্ব নিয়ে।

সর্বশেষে সঞ্চয় করেছি কয়লাখাদের কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা। Serampur Coal Co-র হাজার ফুট খনিটা এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা গভীর। পিটে ওঠা-নামার একমাত্র পথ লিফটটা কি বিদ্‌ঘুটে! যখন নামলাম তখন কানটা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল, মাথাতেও অস্বস্তির ভাব। আমরা নীচে নামছিলাম, কিন্তু বায়ুচাপ বৃদ্ধির ফলে অনুভব করলাম যেন উপরে উঠছি। কালো দেওয়ালের গা থেকে ঝরঝর করে অবিশ্রান্ত ধারে জল ঝরে পড়ছে। যেখানে নামলাম সেটা পাতালের একটা মোড়—৬।৭ হাত চওড়া, ৪।৫ হাত উঁচু বহু অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ সেখানে মিলেছে। তারই মাঝে ১½ থেকে ২ হাত চওড়া ট্রলি লাইনে হলেজের সাহায্যে কয়লা এসে জমা হচ্ছে মোড়ে। আলোও জ্বলছে। পাম্পঘরে ৭টি পাম্প খাদের জল বার করে দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এর একটি বিকল হলেও প্রাণহানির গুরুতর আশঙ্কা। দিনরাত্রি যন্ত্রচালিত একটি বিরাট এক্‌ঝষ্ট পাখার সাহায্যে দূষিত বায়ু বের করে দেওয়ার ফলে খাদের মধ্যে সর্বদা শোধিত বায়ুর একটা স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে।

খনি থেকে একটু দূরেই কোক্ আভন্। গুঁড়ো কয়লা থেকে কোক কয়লা তৈরী হয়ে সেখান থেকে চালান যায় শিল্পাঞ্চলে। এ ছাড়া আলকাতরা, লাইকার এমোনিয়া, স্যাপথলিন্ ইত্যাদিও তৈরী হচ্ছে।

গিরিডির ঐশ্বর্যের প্রধান উৎস তার অভ্রশিল্প। কোডারমা হ'তে যে অভ্র আসে, দক্ষ কারিগরের হাতে তা বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেশে-বিদেশের বাজারে চালান দেওয়া হয়। এজন্য এখানে বহু ছোটবড় কারখানা গড়ে উঠেছে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। এ ক'দিনে গিরিডির সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজ বিদায়ের দিনে তাই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম। গোধূলির শেষ আলো আকাশের গায়ে তখনও লেগে আছে। ট্রেনের বাঁশীর অস্পষ্ট সুর গিরিডির জনহীন প্রান্তরে আর পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল।.....

কুসুম-শর ॥ অসীম সেনগুপ্ত। ভারতী নিলয়। ৬, রাজা সুবোধ মল্লিক রো কলিকাতা-৩২। মূল্য ২'৫০।

শ্রীমান্ অসীম সেনগুপ্তের লেখা গল্পের বই 'কুসুম-শর' পড়েছি। নামেই প্রকাশ গল্পগু প্রেমের। গল্প বলার আধুনিক রীতিটি লেখক আয়ত্ত করেছেন। স্থানে স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি পুনরুক্তিদোষ দেখা গেলেও ভাষা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শব্দ-রচনায় বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য।

প্রেমের প্রথম পদক্ষেপের ছন্দ এবং অতৃপ্ত যৌবনচেতনার অসহায় যন্ত্রণা লেখকের রচনায় বে ভালোভাবেই ফুটেছে। প্রেমরোমাঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির রূপলীলার সংযত ও সংক্ষিপ্ত রেখ চিত্রগুলি খুবই উপভোগ্য। 'মাছ' গল্পে পুকুরের সঙ্গে অন্ধকার রাত্রি এবং বন্দী যৌবন-কামনার সং কালবোস মাছটির উপমা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক।

'কুসুম-শরে' মোট পাঁচটি গল্প : মাছ, চোখ, শিকার, পাখী, কুসুম-শর। আগের দুটিতে সমাজে অধস্তন মানুষ ও মন চিত্রিত হয়েছে। শেষের তিনটি রচিত হয়েছে শহরজীবনের পটভূমিকায়। অধস্ত সমাজের মানুষ ও মনের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। অশিক্ষিত অন্ত্যজদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে লেখক এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আপাতদৃষ্টিতে রুচিবহির্ভূত বলে মনে হতে পারে— কিন্তু শিল্পবিচারে তা সঙ্গত হয়েছে বলেই আমার ধারণা। এই স্থলে লেখকের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণী আমি উচ্চারণ করতে চাই। লেখক তাঁর গল্পগুলিতে প্রেমের যে বিশেষ বিশেষ দিক দেখেছেন ও দেখাতে চেয়েছেন—সেই সমস্ত বিশেষ দিকে মাত্রাবোধ ও সংযম-সাধনার একান্ত প্রয়োজন। কুসুম-শরের একাধিক স্থানে এই মাত্রাবোধ ও শিল্প-সংযমের অভাব ঘটেছে। 'মাছ' একটি নিখুঁত গল্প হতে পারতো,—কিন্তু 'ময়না'র স্নান করার ব্যাপারটা টেনে দীর্ঘ করার দোষে কৌতূহল মন্দীভূত হয়েছে। 'পাখী' গল্পে অমিয় সেনের স্মৃতি নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি বস্তুতত্ত্ববিরোধী বলেই মনে হয়। 'শিকার' অত্যন্ত মামুলী।

এ গ্রন্থের সত্যকার ভালো গল্প 'চোখ'। 'কুসুম-শর'কেও উল্লেখযোগ্য বলতে পারেন। 'চোখে' আকবরের ক্ষুব্ধ চরিত্রের ভয়াবহতা খুব স্বাভাবিক। 'ছোট বিবি'র ওপর তার ভালোবাসার অতিশয্যটি উগ্র বন্যতার সহজ সৌন্দর্যে প্রকাশ করা হয়েছে। গল্পটির শেষাংশ রহস্যোদ্দীপক এবং শিল্পসম্মত। 'কুসুম-শর'কেও উল্লেখযোগ্য বলেছি। একজন রুগ্ন বালকের 'মরবিড' হৃদয়ভাবের বেদনাময় কাহিনী হচ্ছে 'কুসুম-শর'। অলকের গোপনমনের বিশ্লেষণে তরুণ লেখক যে-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন— রসিকচিত্তকে তা নাড়া দেবে।

পরিশেষে লেখকের ভাষার ত্রুটি সম্বন্ধে একটি বিষয় উল্লেখ করবো। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে—শব্দ ব্যবহারে লেখক সর্বত্র সচেতন নন। অন্তর্দৃষ্টি যে গহীন মনস্তত্ত্ব ভেদ করতে গিয়ে লেখক নায়িকার 'দুই চোখে দুটো সাপ' কি নায়কের 'দু-চোখে দুটো বিড়াল' দেখেছেন—তার প্রশংসা অবশ্যই করবো, কিন্তু এই প্রকাশকৌশল যদি একাধিক ক্ষেত্রে আরোপিত হতে দেখি— তবে এ কথা কি বলবো না যে, পাঠকের কৌতূহলী রসিক মনটা গল্পের স্বপ্নস্বর্গে পরিভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ পুনরুক্তিদোষের বস্তুকঠিন বন্ধ্যাভূমিতে পড়ে হাহাকার করে?

বই-এর ছাপা-বাঁধাই ভালো। প্রচ্ছদপট মনোরম।

অ-র-মু

ছায়ালোক ॥ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রকাশক শ্রীধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী। ১৯৪বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। মূল্য টা. ২·৭৫।

আধুনিক সময়ের যে কোনো গল্পসংগ্রহ হাতে নিলেই যে বিকৃত মন ও বুদ্ধি, যে ধ্বংসোন্মুখ পরিবেশের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হওয়া প্রায় অনিবার্য, 'ছায়ালোক' তার একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। নতুন সাহিত্য পাঠে বিপর্যস্ত মনের কাছে দ্বাদশটি গল্পের এই সংকলনটি একটি প্রীতিস্নিগ্ধ উপহারের মত।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর লেখনী যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড। গল্পের পর গল্প পড়ে যেতে থাকলে অজ্ঞাতসারে তাঁর লেখনী কেমন করে যেন আমাদের মনের চারিপাশে একটা মায়াজাল বুনে দেয়; লেখক আমাদের নিয়ে যান এক রসলোকে—ছায়ালোকে।

'বাইশ বছর পরে' গল্পের অন্যতমা পাত্রী মিসেস হেন্‌লি এক জায়গায় বলছেন, "...মরণের পরও মানুষ-জীবনের একটা বিশেষরকম সত্তা থাকে এবং সে সত্তায় এ জীবনের স্মৃতি অন্তত কিছুদিন বর্তমান থাকে..."—এই জাতীয় বিশ্বাসের পটভূমিতেই ছায়ালোকের কাহিনীসমূহ রচিত এবং 'লেখকের নিবেদন' অংশে শ্রীচৌধুরী নিজেও সেকথা জানিয়েছেন।

সচেতনে অবচেতনে এ-বিশ্বাস আমাদের অনেকেরই আছে। আর সেই রন্ধ্রপথেই গল্পগুলো তাদের অতিলৌকিক ডানা মেলে, গড়ে তোলে এক মেদাচ্ছন্নতা—যা ভীষণ বা ভয়াল নয় বরং মেদুর। অর্থাৎ ভূতের গল্পের গা-ছমছম্ করার দিকটায় লেখকের তেমন কোনো কৌতূহল নেই, তাঁর শিল্পদৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ।

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষ এই পৃথিবীর হাসিকান্নার দিনগুলোকে সহজে ছেড়ে দিতে চায় না। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও সে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের বিচিত্র আনন্দরসে ভরা জীবনের সুধাপাত্রখানিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায়, জীবনের মায়াতেই সে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে না। সেই চিরন্তন, সেই আদিম, সেই মৌলিক জীবনতৃষ্ণাই এই গল্পগুলির উৎস। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' এই সুরটিই তাঁর প্রত্যেক কাহিনীর মর্মমূলে ধ্বনিত হচ্ছে—এগুলির অনন্যতা এখানেই।

প্রোফেসর বীরেনবাবু, দীননাথের স্ত্রী, ব্যারিস্টার চৌধুরী প্রভৃতি সমস্ত গল্পেরই প্রধান পাত্র-পাত্রীরা জীবিতকালে যা বা যাকে ভালোবেসেছেন, ধূলির স্বর্গে তাঁদের সেই অতি প্রিয় মানুষ ও বস্তুগুলোকে ঘিরে তাঁদের কান্না মর্ত্যকায়ায় না থাকলেও ছায়াশরীরে এখনও বিরামহীন। ঐ ভালোবাসার টানেই মরে গিয়েও শেষ হয় না তাঁদের অভিসার, ব্যাকুল চাওয়ার এই পৃথিবীটাকে ঘিরে তাঁদের শেষ বসন্ত হ'য়ে থাকে চিরবসন্ত। ছায়ালোকের এই অভিসারে মর্ত্যের জীবিত মানুষের দল হয়তো ভয় পায়, আর সে চিত্রও শ্রীচৌধুরীর সতর্ক শিল্পীমন উপেক্ষা করেনি। আসলে কিন্তু তাঁর শিল্পীচেতনা ভালো লাগার স্পর্শবিজড়িত এইসব মানুষদের আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরেই বিশুদ্ধ। সেইজন্যই তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীরা চরিত্ররূপে যথেষ্ট ব্যঞ্জনাময় না হ'য়েও এই মানবিকতার স্পর্শে আমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র পাঠচক্র

"রবীন্দ্র পাঠচক্র" আশুতোষ কলেজের একমাত্র সাহিত্য-সংস্থা। এ বছরে পাঠ
তের বছরে পদার্পণ করল। অনেক ঝড়ঝাপ্টা এড়িয়ে, অনেক সুখস্মৃতি
রবীন্দ্র পাঠচক্র এগিয়ে চলেছে। আরম্ভের সময় পাঠচক্রের পরিসর ছিল
তাই নিজেদের দোষত্রুটিগুলো নিজেদের দিয়েই সংশোধন করে নেওয়া যেত।
সে তুলনায় এখন পরিসর হয়েছে বৃহৎ, তাই সে সুযোগ কম। অবশ্য পাঠচ
পরিসর দিন দিন আরও বড় হোক, এই আমার কামনা।

অন্যান্য বারের তুলনায় এ বছরে অনেক পরে—মার্চ মাসে, আমরা কাজের
পেয়েছি। আর Union থেকে অর্থকরী সাহায্য পেয়েছি তারও বেশ কিছু প
এ সাহায্যও পুরোপুরি আমরা পাইনি। এই দুই কারণে আমাদের পরিকল্পনা
বাস্তব রূপ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্র পাঠচক্রের কার্যকরী সমিতি
উদ্যোগে সভ্যদের প্রথম যে সভা হয়, সে সভায় ভবিষ্যৎ কার্যসূচী কি হবে, সে সম্ব
কতকগুলি প্রস্তাব করা হয় এবং কিছু প্রস্তাব গৃহীতও হয়। সভ্যদের প্রথম প্রস্ত
ছিল, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সাহিত্য রসজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে তাঁদের ভাষণ শো
আর দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল ছাত্রবন্ধুদের স্বরচিত রচনা-পাঠ ও সেই রচনাগু
সম্বন্ধে আলোচনা করা।

পাঠচক্রের তরফ থেকে আমাদের প্রথম অধিবেশন হয় মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে
এই অধিবেশনে বা সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন এ
প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সমালোচক ডঃ শ্রীকুমা
বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিনের সাহিত্যসভায় আলোচনার বিষয় ছিল যুদ্ধোত্তর বাংল
উপন্যাস। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে বাংল
সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন

বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শতভিষা প্রকাশনী। মূল্য আট আনা।

এক পাখি ॥ রমাপ্রসাদ দে। গ্রন্থসভা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ দুটির মধ্যে প্রথমটির কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পরিচিত। 'বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

'এক পাখি'র কবি রমাপ্রসাদ দে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে বোধ করি সর্বকনিষ্ঠ। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবিতার সংখ্যা উনিশ। রচনাকাল সম্ভবত ১৩৬৪, অর্থাৎ কবি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র।

আলোচ্য দুটি গ্রন্থই আমার ভালো লেগেছে। বিশেষ করে 'এক পাখি'।

দেবীপ্রসাদের 'নীলাম্বরী' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা স্বভাবতই 'বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা' পড়ে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হবেন। কারণ কবির যে স্বমহিম বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে আমাদের আনন্দ দিয়েছিল তা এখানে বহুলাংশে অনুপস্থিত।

বস্তুত 'নীলাম্বরী' গ্রন্থে কবির যে অভাবটি মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছিল, কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা এবং মানসিক উৎকণ্ঠায় চাপা পড়েছিল, সেটি এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। দেবীপ্রসাদের কবিতা আমাকে যতটা খুশী করেছে ততটা ভাবায়নি। অথচ নিছক পড়তে ভাল লাগাটা যে কাব্যপাঠের একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি নয়, এবং তার দ্বারা উপার্জিত খ্যাতির আয়ুও যে বেশী দিনের নয়, যে কোন দেশের যে কোন সাহিত্যেই তার নজীর মেলে। 'বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা' নিঃসন্দেহেই পড়তে ভাল লেগেছে।

কবি দেবীপ্রসাদের মানসিক ভিত্তি বৈষ্ণব সাহিত্য, ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠের উৎকট ও সংক্রামক অভিমান নয়। তিনি বাংলা দেশের কবি। এ দেশের রূপপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ। এবং তাঁর কাব্য পাঠে এরই অনুষঙ্গগত একটা পুনরুদ্ধারের আনন্দ পাওয়া যায়। এই আনন্দ বর্তমান গ্রন্থেও মিলবে। যে সত্যিকার প্রেরণা সাধারণকে অসাধারণ করে তোলে তা ছাড়া এখানে আর সবই আছে। শব্দদেহ ও চিত্রকল্প মনোহর। ছন্দ শাস্ত্রসিদ্ধ।

কিন্তু 'এক পাখি' পড়ে যথার্থই বিস্মিত হয়েছি। কবি একজন বালক। অথচ কাব্যক্ষেত্রে তিনি যে নাবালক নন, পরিণত রুচি ও অকৃত্রিম প্রেরণার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি বললেই ঠিক বলা হয়। কবির ভবিষ্যৎ নির্ভুলভাবে উজ্জ্বল। ছন্দ, চিত্রকল্প রচনা এবং উপলব্ধির ব্যাপারে যে কিছু কিছু ত্রুটি নেই তা নয়, তবে কবিতাগুলির রচনাকাল লক্ষ্য করলে সেসব ত্রুটি উপেক্ষণীয়। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর কাব্য হৃদয় হ'তে উৎসারিত, কোন কৃত্রিম আত্মপ্রতারণা থেকে নয়। তাঁর হৃদয় যেদিন বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে, সেদিনের আশায় রইলাম।

অসীম সেনগুপ্ত

দুখানি নতুন বই ॥

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ॥ ডাঃ বিমলকান্তি সমাদ্দার।

Sepoy Mutiny—A Social Study and Analysis—Prof. Haraprasad Chatterjee.

সহানুভূতি সহৃদয়তার দ্বারা কলেজের এই সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। U থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য আরও বেশী না হলে এ সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখা নয়। Students' Unionএরও এদিকে নজর রাখা উচিত। রবীন্দ্র পাঠচ নাম আরও বিস্তার লাভ করুক এই কামনা নিয়ে লেখা শেষ করছি।

কল্যাণাশিস্ দাশ
সাধারণ সম্পাদ

সাংস্কৃতিক পরিষদ

এবারকার কৃষ্টি পরিষদ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়ে এটা আমার জীবনে এক চরম পরীক্ষা। দৈনন্দিন কার্যসূচীর মাধ্যমে পরিষ কতখানি অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে পেরেছি, তার হিসাব দেবার পালা এ এসেছে।

কালচক্রের দ্রুত আবর্তনে বছর যে কোথা দিয়ে চলে গেল তা জানব অবকাশ পেলাম না। তাই আজ, আমি আমার প্রতিশ্রুতির কতটুকু প করতে সমর্থ হয়েছি তা বলা শক্ত।

কার্যভার পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এল ২৩শে জানুয়ারী—'নেতাজীর জন্মদিবস'।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও ভারত-মাতার এই অমর সন্তানের জন্মদি উপলক্ষে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও আলোচনার ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব মনোরম পরিবে সৃষ্টি হয়, প্রভাত, দিবা ও সান্ধ্য বিভাগীয় সতীর্থগণের অদম্য প্রচেষ্টায় পূজনীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর সহযোগিতায়।

এরপর পালন করা হলো, "২৬শে জানুয়ারী"—গণতন্ত্র দিবস। জাত জীবনের এই স্মরণীয় দিনের অনুষ্ঠানে নৈশ বিভাগীয় উপাধ্যক্ষ শিবনাথ চক্রব মহাশয় একটি আবেগপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। এবং আমরা নীরবে দে প্রেমিক শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

তারপর এল ছাত্রজীবনের চরম এবং পরম আনন্দোৎসব, "সরস্বতীপূজা এবারেও তিন বিভাগের সহকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং কর্মতৎপরত অপূর্ব কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে এই মহান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপল কয়েকজন বেতার-শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে একটি ছোট পরিপাটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ম আমরা বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন করি।

এবার, যাঁরা এই মহাবিদ্যালয়ে নতুন এসেছেন তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানাব

সভাপতি, অধ্যক্ষ সেন মহাশয় এরকম সাহিত্যসভার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। সেদিনের সভায় আরও যে সমস্ত অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন উপাধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দে, অধ্যাপক বিমল সমাদ্দার, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এরপর বাৎসরিক পরীক্ষা এসে পড়ায় আর কোনো সভা করা সম্ভব হয় নি। তবে আমরা আরও কয়েকটি সভা করব বলে আশা রাখি।

রবীন্দ্র পাঠচক্রের মুখপত্র 'লিপিকা' সুযোগ্য সম্পাদক অজয় গুপ্ত ও সুহৃদ্ চট্টোপাধ্যায়ের রেখায়, লেখায় এবং কলেজের ছাত্রবন্ধুদের রচনাসম্ভারে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার ধারণা এবারের 'লিপিকা' গুণের বিচারে অন্যান্য বারকে ছাপিয়ে গেছে। এর জন্য আমরা 'লিপিকা'র সম্পাদকদ্বয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দ্রুত প্রস্তুতির মধ্যে হলেও আমরা এবার ২২শে শ্রাবণ 'রবীন্দ্র স্মৃতি-বাসর'-এর আয়োজন করেছিলাম। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। আবৃত্তি করেন রমাপ্রসাদ দে, সুজিতকান্তি সুর, ইন্দ্রজিত সেন এবং উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত করেন সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় ও সুখেন্দু লাহিড়ী।

নানা কারণে এবার আমরা গত বছরের সভাপতি অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতিরূপে পাইনি। পরিবর্তে পেয়েছি অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের রবীন্দ্র পাঠচক্রের কার্যকরী-সমিতির সভাপতি ও সভ্যদের নাম নীচে দেওয়া হলো। সভাপতি—অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—প্রণব চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক—কল্যাণাশিস্ দাশগুপ্ত, সহঃ সম্পাদক—সলিল চক্রবর্তী; লিপিকার যুগ্ম-সম্পাদক—অজয় গুপ্ত ও সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য সভ্যেরা হচ্ছেন—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়; বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, সুজিতকান্তি সুর, প্রদীপকান্তি গুপ্ত, হরিরঞ্জন ঘোষ, সমর সেন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রেবন্ত চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার ধর, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দু বসু, শ্যামলকুমার কয়াল, কমল দে তরফদার, অসিত ঘোষ, অসিত ভট্টাচার্য, তপন রায়চৌধুরী, ব্রজানন্দ রায়, নিতাইচাঁদ শীল, অমলেন্দু শুর ও ভূপেন্দ্রনাথ হালদার।

রবীন্দ্র পাঠচক্রের কাজের ভার পাবার আগে আমাদের মনে বিরাট আশা ছিল। মনে মনে একটা কর্মসূচীও স্থির করেছিলাম। কিন্তু কার্যভার যখন হাতে নিলাম, তখন দেখলাম, সময় অভাবে অনেক কিছুই করতে পারিনি। কলেজের কর্তৃপক্ষকে আমি রবীন্দ্র পাঠচক্রের সভ্যদের তরফ থেকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা যেন

দিয়ে আমরা আমাদের নতুন ছাত্রবন্ধুদের খুব তাড়াতাড়ি নিজের করে
পেরেছি।

লেখাপড়া বাদ দিলে ছাত্রজীবনের যেটি অপরিহার্য অঙ্গ তা হচ্ছে খেলা
কাজেই খেলাধুলা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যাক। শরীর ও মনকে সুস্থ
সতেজ রাখবার জন্য আমাদের যতখানি খেলাধুলা করা প্রয়োজন তা কর
সুযোগ আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের অধীক্ষক মহাশয় যথেষ্ট প্রের
দিয়েছেন। খেলাধুলা সম্পর্কে প্রধান ঘটনা হচ্ছে আমরা নতুন ছাত্রাবা
বন্ধুদের সঙ্গে একটি করে ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছি। প্রথম খে
হয়েছিল অমীমাংসিত এবং দ্বিতীয়টিতে আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ পরাজিত হয়েছিল
পরাজিত হলেও নতুন ছাত্রাবাসের আবাসিকবৃন্দ এবং আমাদের কলেজের
অধ্যক্ষ এবং নতুন ছাত্রাবাসের অধীক্ষক মহাশয় তাঁদের সহৃদয় ব্যবহারে আমা
পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়েছেন। ভলিবলে আমরা প্রাক্তন ছাত্রদের
যে ম্যাচ খেলেছিলাম তাতে জয়লাভ করেছি। খেলাধুলা সম্পর্কে একটা
না বলে পারলাম না। মাঠের অভাব আমাদের খেলাধুলার এক প্রধান অন্তরা
দীর্ঘ পথকষ্টের জন্য অনেককে নিরুৎসাহ ও খেলা থেকে নিরস্ত হতে দেখেছি।

এবার পড়াশোনার কথায় আসা যাক। পড়াশোনাতে আমাদের প্রতি
আবাসিকই যে মনোযোগী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরীক্ষার ফল। এবারে ছা
বাসের যে কজন B. Sc. পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের তিন জন অনার্স ও তি
জন ডিষ্টিংশন পেয়ে পাশ করেছেন। Intermediateএর ফলাফলও কৃতিত্বপূর্ণ।

আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু'এক কথা বলতে হচ্ছে। সাংস্কৃতি
অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আনন্দমুখর অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাদের "বা
বন্দনা"। প্রতিবছরের মত এবারেও প্রতিটি আবাসিকের আন্তরিক সহযোগিত
আমাদের বাণী-বন্দনা বেশ ধুমধামের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এর প্রশং
আমরা অনেকের মুখেই শুনেছি। এর জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই এই ছাত্র
বাসেরই প্রাক্তন আবাসিক শ্রীপ্রণব মজুমদার ও আমাদের কলেজের ছা
শ্রীবাসুদেব ঘোষ—এ ব্যাপারে তাঁদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। এ ছাড়া ১৫
আগস্ট, ২৩শে জানুয়ারী প্রভৃতি স্মরণীয় দিনগুলিও আমরা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে
মাধ্যমে পালন করেছি।

একটা কথা দুঃখের সঙ্গে জানাতে হল যে, সময়মত স্থান নির্বাচন করতে
না পারায় আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবারও বন্ধ রাখতে হয়েছে, আমাদের
আশা আছে, আগামী বছর এই আনন্দ অভিযানে কোনও বাধার সৃষ্টি হবে না।

জন্য এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। গান, বাজনা, ম্যাজিক ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ পরিচালিত "নবসংস্করণ" নাটিকাও মঞ্চস্থ করা হয়।

এই সব অনুষ্ঠান পরিচালনার সাফল্যের যথাযথ বিচারের ভার ন্যস্ত করলাম আমার ছাত্র-বন্ধুদের উপর।

আমার বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। তবু এখনও যতদিন আছি আশা আছে অনেক; জানি না সে আশা ও স্বপ্নের কতটুকু সফল হবে। তবে শুধু এইটুকু জানি সকলের সাহচর্য ও ঐকান্তিক সহযোগিতা পেলে হয়তো সে আশার-স্বপ্ন সবটুকুই বাস্তবে রূপায়িত করে যেতে পারব।

এবারে আমি জানাই আমার সহকর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, বিশেষ করে সুব্রত ও কল্যাণকে। আর প্রণাম জানাই তাঁদের যাঁরা সব সময় সুচিন্তিত উপদেশ দানে আমাকে উৎসাহিত করেছেন—মাননীয় অধ্যাপক সুনীলকুমার সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাস ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ ব্যানার্জী মহাশয়দের। আর নতুন উদ্যম নিয়ে যাঁরা এসেছেন সেই নবাগতদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার বিবৃতি আজ এখানেই শেষ করলাম।

চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য
কৃষ্টি-সম্পাদক

পুরাতন ছাত্রাবাস

(১৬ নং বসন্ত বোস রোড)

অনেকদিন পরে যখন মধুর পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের জন্য পিছনের দিকে ফিরে তাকাব তখন সর্বপ্রথমেই মনের কোণে ভেসে উঠবে ১৬নং বসন্ত বোস রোডের আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাসের পাটল রঙের বাড়িটা। আর সেই সঙ্গে মনে ভিড় করে আসবে সেই বন্ধুদের মধুময় স্মৃতি, যাদের সঙ্গে এই আবাসিক জীবনের সোনার দিনগুলি কাটিয়েছি।

ছাত্রাবাসের কথা বলতে গিয়ে যাঁর কথা বারবার মনে পড়ছে তিনি হচ্ছেন আমাদেরই ছাত্রাবাসের অধীক্ষক মহাশয়। তাঁর প্রতিটি মূল্যবান উপদেশ এবং আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা কেবল আমাদের আবাসিক জীবনের অমূল্য সম্পদ নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেরও পাথেয়। প্রতিবারের মত তাঁরই সভাপতিত্বে নতুন ছাত্র-বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে যে মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তা ক্ষুদ্র হলেও অনেকদিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য

গতবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের কথা উল্লেখ করতে গেলে আমা ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কৃতিত্বের প্রশংসাই করতে হয়।

অন্যান্য বছরের মত এবারও আমরা স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্মদিব সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করি।

খেলাধুলায় পুরাতন ছাত্রাবাসের বন্ধুদের সঙ্গে এবারেও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি হয়েছিল। ফুটবল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল, কিন্তু ক্রিকেট খে আমরা জিতেছিলাম। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে উভয় খেলা পুরাতন ছাত্রাবাসের আবাসিকেরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এই আমাদের ছাত্রাবাস-জীবনের একবছরের কাহিনী। ছাত্রাবাস-জীব শতেক সৌভাগ্যের একটির কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। সেটা হ অধ্যাপকবৃন্দের আত্মীয়সুলভ ব্যবহার ও সান্নিধ্য। বাৎসরিক ভ্রমণযাত্রায় আ আমাদের মাঝে তাঁদের কয়েকজনকে পেয়েছিলাম। বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে আ সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রব মহাশয়কে। তাঁর ছোট্ট অথচ অমূল্য ভাষণ আমাদের মনের তৎকালীন ব্য প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল।

পথ আমাদের সাথী—এগিয়ে চলাই আমাদের কাজ—যেন পিছিয়ে না পড়ি প্রার্থনাই করি। সকলকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার।

অচ্যুতানন্দ সরকার
সাধারণ সম্পাদক,
আশুতোষ কলেজ নতুন ছাত্রাব

সাহায্য-ভাণ্ডার

ডিউক অব উইণ্ডসর তাঁর আত্মজীবনীতে "ইংলণ্ডের রাজার পাওয়ার ও রেস্পন্সিবিলি সম্পর্কে যা লিখেছেন, 'Students' Aid-fund' সম্পাদকের পক্ষে সেই উ প্রযোজ্য নয়। ছাত্রেরা তার উপর চাপিয়েছেন অপরিসীম দায়িত্ব, কিন্তু বাস্ত ক্ষেত্রে তার হাতে দেওয়া হয়েছে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। এই দায়িত্ব হাতে নেবার প বুঝলাম যদি আমাকে কলেজের ছাত্রদের জন্য সত্যিকারের কাজ করতে হয়, য কলেজের দরিদ্র ছাত্রভাইদের জন্য "স্থায়ী পুওর ফাণ্ড" স্থাপন করতে হয় তাহ প্রথমেই প্রয়োজন "ছাত্রসংসদ-সংবিধানের" সম্পূর্ণ পরিবর্তন। এ বছরের ছাত্রসংস সংবিধান পরিবর্তন করে তাকে যে নূতন রূপ দিতে চলেছেন তাতে রয়েছে কলেজে

পরিশেষে আমাদের চলার পথ সহজ ও সরল হোক এবং আমাদের আবাসিক জীবন মধুর হতে মধুরতর হয়ে উঠুক—এই প্রার্থনা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

বিলাসচন্দ্র মহলানবীশ
কমনরুম সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ পুরাতন ছাত্রাবাস

নতুন ছাত্রাবাস

ভারতের অন্যতম পীঠস্থানে যাত্রার পথে অবস্থিত যে বাড়িখানি আপন প্রৌঢ়তা ও গাম্ভীর্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে আমাদের আবাসগৃহ। কয়েকটি বিদ্যার্থীর আবাস ও সাধনাস্থল। এর সর্বত্র একটা শান্তরস বিরাজ করছে। বাইরের প্রশান্তি বজায় রয়েছে আবাসিকদের শৃঙ্খলাবোধে। ভিতরের প্রশান্তি এসেছে অধীক্ষক মহাশয়ের আন্তরিকতাপূর্ণ সস্নেহ ব্যবহারে। কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন সম্পূর্ণ আপন জন রূপে।

বছর শেষে, সারা বছরে কি করেছি, কি না করেছি একবার ভেবে দেখতে ইচ্ছে হয়। বর্তমান বৎসরের প্রারম্ভে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাৎসরিক সাধারণ সভা—ঐ সভায় নবাগতের সংবর্ধনা জানান হয় এবং সাধারণ সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক, ক্রীড়া-সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাহকদের নির্বাচিত করা হয়।

বাৎসরিক আনন্দ-ভ্রমণ উপলক্ষে এবার আমরা ঝরিয়া কয়লার খনি অঞ্চলে গিয়েছিলাম। বন্ধুবর শ্রীশতব্রুশোভণ চক্রবর্তী ছিলেন এই ভ্রমণের প্রধান উদ্যোক্তা। যাঁর আতিথ্য আমরা গ্রহণ করেছিলাম তিনি হচ্ছেন ঝরিয়াক্ষেত্রের প্রভাবশালী শিল্পপতি শ্রীঅর্জুন আগরওয়ালা। তাঁর সহৃদয় ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্য আমাদের বিস্মিত করেছে।

তারপর আসে সরস্বতী পূজা। পূজা শেষে দুদিনের অবিমিশ্র আনন্দোপভোগের পর আসে ক্ষণিকের ব্যথা এবং আগামী পরীক্ষার ভীতি।

দোলযাত্রার পরেই বিদায়ের সুর বাজে। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতে হয়। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ও গাম্ভীর্যে সে সময় ছাত্রাবাসের আবহাওয়া করুণ হয়ে ওঠে।

এবারের ক্রীড়া-সম্পাদক শ্রীআনন্দদুলাল বেরা এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ জানা তাঁদের নিজ নিজ বিভাগে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

তাঁদের অন্তরের সুপ্ত চেতনা ও মনের ভাব প্রকাশ করবার সাহসকে সংকোচের প্রাচীর বেষ্টনীর থেকে মুক্তি দেবেন।

গত এপ্রিল মাসে কলেজের আন্তর্বিভাগীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা খুবই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বিতর্কাধ্যক্ষ এবং কলেজের উপাধ্য নীরদকুমার ভট্টাচার্য এবং কলেজের অধ্যাপকগণ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লাহিড়ী চৌধুরী ও কলেজ ইউনিয়নের সভাপতি শিশিরকুমার দাস মহাশ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করেছি। আমি তাঁদের আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এ সম্বন্ধে আমার আর একটু বলবার আছে। বিভিন্ন সামাজিক সম ছাত্রদের সচেতন করে তোলার দায়িত্ব ছাত্র-সংসদের রয়েছে। অন্যান্য ক এ বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে তখন আমাদের পূর্ববর্তী ছাত্র-সংস কোনও কারণেই হোক এ কাজে হাত দিতে পারেন নি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের এই পরিকল্পনাকে কা দিতে সাহায্য করবেন। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আন্তঃকলেজ এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। আশা করি এ বিষয়ে ছাত্র কলেজকর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না।

সুনী
বিতর্ক

চীপ স্টোস

এবারের ছাত্র-সংসদে আমরা যুগ্ম-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হবার স্টোর্সকে নতুন ভাবে সজ্জিত করে ঠিকমত চালু করার দায়িত্ব আমা আসে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের আগে নানান অসুবিধা এবং কাগজে ঠিকমত চালু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এতদিন আমরা ছাত্রবন্ধুদের বাজার অপেক্ষা সস্তায় খাতা এবং কালি করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। শুধু চেষ্টা করেছি বললে ভুল হবে—এখন তবে এরজন্য এবং চীপ স্টোর্স নামের সার্থকতা বজায় রাখতে আমা পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ বাজারে সস্তায় কাগজ পাওয়া দুষ্কর। ছাত্রবন্ধুদের সাধ্যমত অল্পমূল্যে খাতাপত্র সরবরাহ করে তাদের বিশেষ করেছেন Sarada Agency। আর কালি সরবরাহ করে সাহায্য করছেন

গরীব ছাত্রভাইদের জন্য 'স্থায়ী-পুওর ফাণ্ড' গঠনের ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রত্যেক ছাত্রবন্ধুর সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এ গেল 'স্থায়ী-পুওর ফাণ্ড' গঠনের ব্যাপার। কিন্তু, সাময়িকভাবে কলেজের দরিদ্র ছাত্রভাইদের সাহায্যের জন্য আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর একটি 'Film Show'-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। একে সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ছাত্রবন্ধুর সক্রিয় সহযোগিতা।

পশ্চিম বাংলার অনেক কলেজেই দরিদ্র ছাত্রদের জন্য 'Text Book Library'-র ব্যবস্থা আছে। আমাদের কলেজে ছাত্রদের এই অভাব পূরণের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। আমরা আশা করি, অধ্যক্ষ মহাশয় কিছুদিনের মধ্যেই 'Text Book Library'-র ব্যবস্থা করবেন।

অনেক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ নিয়ে প্রথম কার্যভার গ্রহণ করেছিলাম। তাই আজ সমস্ত বছরের কাজের হিসেব দিতে বসে দেখি প্রায় কিছুই করতে পারিনি। তবে এ বছরের ছাত্রসংসদ-সভ্যদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ঐক্যবদ্ধ কাজের ক্ষমতার প্রকাশ দেখেছি আশুতোষ কলেজের ইতিহাসে তা সত্যই অভূতপূর্ব। যাঁর কাছ থেকে এই উদ্যম ও প্রেরণা লাভ করেছি তিনি আমাদের অতিপ্রিয়, নিরলস কর্মী তরুণ ছাত্রনেতা ছাত্রসংসদ-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। তাঁকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের শেষে কলেজের ছাত্রবন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি।

তপন রায়চৌধুরী
সম্পাদক, ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডার

বিতর্ক সংবাদ

প্রতি বৎসরের মত আমাদের কলেজ এবারও কলকাতার অনেক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। বিশেষ করে নেতাজী ভবন এবং হেমচন্দ্র পাঠাগারের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছাড়াও ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ যোগ দেয়।

বাইরের অনেক কলেজ থেকে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগদানের আমন্ত্রণ পাই। কিন্তু প্রতিযোগী ছাত্রের অভাবে সকল প্রতিযোগিতায় আমরা যোগ দিতে পারিনি। আশা করি আগামী বিতর্ক প্রতিযোগিতাগুলোতে ছাত্রবন্ধুদের সহযোগিতা পাব।

ক্যারাম ও দাবা খেলায় আমাদের কলেজের প্রতিনিধিরা সেমিফাইনা
খেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হয়।

এরপর মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ আয়োজিত 'আন্তঃ-কলেজ টেবিল-টেনিস
যোগিতায়' আমাদের কলেজ যোগদান করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোয়াটার
সিটির নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের কলেজের আন্তঃশ্রেণী 'Indoor games' প্রতি
আরম্ভ হয়। টেবিল-টেনিস ফাইনাল কলেজ হল ঘরেই প্রচুর ছাত্রের উ
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খেলা শেষে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পুরস্কার বিতর
অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রতি
নতুন ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। খেলা শেষে উপস্থিত অ
প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

ছাত্র-সংসদের নির্দেশানুযায়ী কমনরুমের উন্নতির জন্ত আমি যথাস
করেছি। এই চেষ্টার ফলাফল আমার সহপাঠীরাই বিচার করবেন।
শীঘ্রই বেশ কিছু নতুন বই আনানো হচ্ছে এবং তার জন্ত একটা
আলমারি ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এতদিন কমনরুমে Statesman
দৈনিক বসুমতী, Reader's Digest, ব্যায়াম ইত্যাদি পত্রিকা ছিল না;
এই সকল পত্রিকা আনানো হয়েছে এবং শীঘ্রই অন্তান্ত পত্রিকা যথাসম্ভব
হবে। খেলাধুলার মধ্যে নতুন একসেট Trade game, Chess ও নতুন
Chinese cracker গেম, অনেকগুলো টেবিল-টেনিস ব্যাট, দু-সেট
ঘুঁটি ও Striker আনা হয়েছে। আশা করি, এতে ছাত্রবন্ধুদের বিশেষ
হবে। সকলে জেনে খুশী হবেন যে আমরা ছাত্র-সংসদের তরফ থেকে ক
রিডিং-রুমটা কলেজে হলঘরের ব্যালকনিতে স্থানান্তরিত করেছি এবং অ
এতে যারা নিরালায় অবসর সময়ে পড়াশুনা করতে চান তাদের পক্ষে সুবি

কমনরুমের লাইব্রেরীর বই দেওয়া, খেলাধুলা ও পড়াশুনা ইত্যাদি
ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে যাতে আরও শৃঙ্খলভাবে
চলে তার জন্তে সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও উপদেশ
করি।

তপনকুমার ব
কমনরুম সম্

Works Ltd. তাই তাঁদের কাছে রইল আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। তবু, যদি এর মধ্যে কোনও সময় আমাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকি তা সম্ভবত কাগজ এবং অন্যান্য কয়েকটি অসুবিধার জন্য। বাস্তবিক এজন্য আমরা দুঃখিত।

এই চীপ স্টোর্সের যাতে সম্প্রসারণ হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। শুধু খাতাপত্র ও কালি কেন,—ভবিষ্যতে ল্যাবরেটারী নোটবুক, পেনসিল প্রভৃতিও বাজার থেকে সস্তায় দেবার আশা রাখি। এরজন্য ছাত্রবন্ধুদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

চীপ স্টোর্সের সফলতায় যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের আশুতোষ কলেজ ইউনিয়নের তরফ থেকে এবং ছাত্র বন্ধুদের পক্ষ হ'তে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। এই সঙ্গে যে কয়েকজন ছাত্রবন্ধু আমাদের সহায়তা করেছেন, প্রবীর, অশোক, ব্রজরঞ্জন, কল্যাণ প্রভৃতিকে এবং আমাদের সংসদের সাধারণ সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্যকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
চীপ-ষ্টোর্স যুগ্ম-সম্পাদক

কমনরুম

কলেজ জীবনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ "কমনরুম" পরিচালনার ভার যখন আমার উপর পড়ল তখন স্বভাবতই খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন এই ছোট কমনরুমের এই বিচিত্র সমস্যার কথা কিছুই মনে পড়েনি। তাই যখন একের পর এক সমস্যা দেখা দিতে লাগল, তখন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের হিতোপদেশ ও ছাত্রসংসদের কর্মীদের আন্তরিক সাহায্য ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে আমি এই সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছি।

বিদায়ী সম্পাদকের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবার পর প্রথমেই টেবিল-টেনিস র‍্যাকেট, বল ইত্যাদি কিনবার ও ভাঙা বোর্ডটা সারাবার বন্দোবস্ত করি। এবার এল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত 'আন্তঃকলেজ ইনডোর গেমস্' কম্পিটিশনে যোগ দেবার আহ্বান। যোগদানের শেষ তারিখে আমার কাছে খবরটা পৌছানতে আমাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতার বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন। কিন্তু আমাদের কলেজ ক্যারাম ও দাবা ছাড়া অন্য কোনও খেলায় তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

তাদের লেখাও 'ছোট'। কিন্তু 'ছোটগল্প' লিখেছেন দু'একজন। যে ধারা
কোণিক পর্যবেক্ষণে বাস্তবের বস্তু থেকে ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচন ও নির্ধারণ
যে দৃঢ়নিবদ্ধ আঙ্গিকে তার প্রকৃত শিল্পায়ন,—বীক্ষণের সেই সূক্ষ্মতা এবং বি
নিপুণতা দুইয়েরই অভাব রয়েছে লেখাগুলোতে। ফলে 'ছোটগল্প'-সঙ্গত
প্রত্যাশায় ঘাটতি পড়বে—বলা বাহুল্য। তবে প্রকাশিত গল্প কটিতে লে
আন্তরিকতার যে সুর রয়েছে এবং সম্ভাবনার, পাঠক তা স্বীকার করবেন।

প্রবন্ধের কথায় প্রথমেই বলতে হয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যুদ্ধোত্তর
সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র কথা। তাঁর এই প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে পত্রিকার মা
করেছে। অন্যান্য প্রবন্ধে মন্তব্যের গভীরতা উল্লেখ্য না হলেও বক্তব্য-বৈ
অভাব নেই।

সাম্প্রতিক কবির বোধ, অবোধ্য ফলতঃ আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য—পাঠ
এই প্রকার অভিযোগ। এর সত্যাসত্য নির্ধারণে বাদানুবাদ অনেক।
সে পথে না গিয়ে কাব্যরসিকের সহৃদয়তায় আস্থা রেখে কবিতাগুলো
করা হলো। আমার বিশ্বাস, কাব্যধর্মের মূলকে নির্মূল না করেও এগুলো ন
মননের প্রণয়নে রসবেদ্য হয়ে উঠেছে।

সংসারের ছোটখাট তুচ্ছতায় নিজেকে ছড়িয়ে রেখে যে মানুষের প্রতি
দীন পরিতৃপ্তি—সময়ে আবার তারই মনের নিরালায় দেখা দেয় একটি ঘ
সত্তার উঁকিঝুঁকি। মনে আর চোখে জানার আর দেখার আগ্রহ। সে
পড়ে 'কয়লাতীর্থে', 'তাম্রলিপ্তে', 'গিরিডিতে'। ভ্রমণকাহিনী কটিতে লে
তাঁদের চোখে দেখার আনন্দকে, মনে পাওয়ার তৃপ্তিকে লেখায় ধরে দি
আশা করি পাঠককে তা খুশি করবে॥

সবার মেলায় যাকে নিয়ে হাজির করবো—হাজিরার আগে তাকে একটা বি
পালা সারতে হবে। আর অনেকের পসরা নিয়ে সে বিচার যখন, তখন সব
এককালে খুশি করা হয়ে ওঠে না। বিচারের মাপকাঠিতে মানের প্রশ্ন,
মনোনয়ন অপনয়নের কথা। তারই ফলে কেউ থাকবেন, কিন্তু বাদ যাবেন অ
কারণ শিল্পসৃষ্টি সাধনসাপেক্ষ।

এই প্রসঙ্গে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির প্রশ্ন তুলছি না এই ভেবে যে, যিনি র
মনের সংকীর্ণতা দিয়ে রসপরিবেশনার এই ভূমিকাকে তিনি অবশ্যই
করবেন না॥

এক ॥

কলেজ পত্রিকার তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলো। এবং এই সংখ্যাকে আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।

প্রচলিত রীতির প্রতি যত না প্রীতি তার চেয়ে বেশী মোহ, ফলে 'সম্পাদকীয়' অংশের এই অনাবশ্যক অবতারণা। কিন্তু যেহেতু অধিকারের সুযোগে বলার জন্যই বলা, সে কারণে—সম্পাদকের বক্তব্য কেবল সম্পাদকীয়তে নয়, সারা পত্রিকায়—রসিক পাঠকের এই ধারণাই সঙ্গত হবে। মনে এই বিশ্বাস নিয়েই দু'কথা বলতে সাহসী হচ্ছি।

ভাব ও রূপের যে অনুষঙ্গে আজ কলেজ পত্রিকার সৌষ্ঠব তার ভূমিকায় রয়েছে আমার পূর্বসূরীদের সমবেত সুচিন্তার সহৃদয় প্রযত্ন। বর্তমানের প্রবহমান পট-ভূমিকায় সেই পূর্বকৃতিরই অনুস্থতিকে পরিবর্তিত সাম্প্রতিকতার মূল্যস্বীকারে কুণ্ঠা বলে মনে হলেও বাস্তবিক তা নয়। অঙ্গে ও রঙ্গে কালের ধারার নিদর্শন এবং পূর্বতন ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগ নির্দেশনা, এই দুই পূর্ব প্রীতি ও মৌলিক রীতি মিলেই শিল্পকৃতি। তাই দুই-ই কাম্য। এর ব্যতিক্রম আমার অভিপ্রেত নয়। পত্রিকায়, পাঠক আশা করি এ পরিচয় পাবেন।

কিছু দেরিতে পেতে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত এবারেও যা লেখা পেয়েছি তা অপ্রচুর নয়। তবে 'পরিমাণে' দপ্তর ভরলেও 'মানে' মন ভরেনি তা বলা বাহুল্য। ফলে মনের আশা পত্রিকার ভাষায় পুরোপুরি রূপ পেল না।

অবশ্য গুণের বিচারে শ্রেষ্ঠ বোধে অনেকের ভিড় থেকে সরিয়ে এনে যে লেখা কটিকে স্থান দেওয়া হলো, পূর্ব বক্তব্য সেগুলি সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য।

সাহিত্যরসিকদের কাছে বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সাম্প্রতিক উৎকর্ষের কথা অবিদিত নয়। সে কারণে আশা করেছিলাম যে, সমৃদ্ধির কিছু আভাস পত্রিকায় দিতে পারবো। কার্যকালে তা হয়ে ওঠেনি। 'গল্প' অনেকে লিখেছেন। এবং

১৯৫৬ সালে দিল্লীতে এশিয়ান লেখক সম্মেলন হয়েছিল। গত
সোভিয়েট রাশিয়ার এশীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা তাসকেন্দে দ্বিতীয় সম্মেলন
করে গিয়েছিলেন। সেই সম্মেলন এবার হবে ১লা থেকে ৪ঠা অক্টোবর
শুধু সারা এশিয়া নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকা এই দুই মহাদেশের প্রতি
লেখকরা তাসকেন্দে সমবেত হবেন। এই সমবেত হবার আকৃতি, পরস্প
পরিচয়, ভাববিনিময়ের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং মানবজীবনের অন্তরতম
থেকে স্বতোৎসারিত। আজকের অস্ত্রশক্তির অধিকারী মানুষ যেখানে লো
ও অবিশ্বাসের প্ররোচনায় পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত সেখানে ভাব
ইতিহাসটুকু স্বর্ণসেতুর মত অক্ষয় হয়ে থাক—আমাদের এই কামনা।

সম্মেলনের উদ্যোগ কমিটিতে নিমন্ত্রিত হয়ে মস্কো গিয়েছিলেন ড
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুলক্ রাজ আনন্দ্।

** ** **

বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্য
কলকাতার তিনটি সংবাদপত্র তিনটি সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। অ
থেকে 'শিশিরকুমার পুরস্কার', যুগান্তর থেকে 'মতিলাল পুরস্কার' এবং আ
থেকে 'আনন্দ পুরস্কার' এবারে যথাক্রমে পেলেন: 'শব্দকোষ' নামক
প্রণেতা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপা
'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য তরুণ কথাকার শ্রীসমরেশ বসু। এ পুরস্কার প্রতি ব
হবে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পোষকতা করার কারণে আমরা
কর্তৃপক্ষকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

** ** **

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফে
দিল্লীর 'সাহিত্য অ্যাকাডেমী' পুরস্কার লাভ করেছে। এবং 'ঘনাদার গল্প' ন
গল্প সংকলনে তিনি পেলেন 'শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার'। শ্রীমিত্রের এ
সাফল্য বাঙালী মাত্রেরই সগর্ব সন্তোষের বস্তু। কিন্তু যেহেতু তিনি
কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সেহেতু আমাদের গর্ব ও সন্তুষ্টির পরিমাণ অতি
নিয়মেই অধিকতর। তাঁকে আমরা পত্রিকার তরফ থেকে অভিনন্দন জান

** ** **

ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ
ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ভারতে এর আগে রবীন্দ্রনাথ ও

দুই ॥

প্রসঙ্গান্তরে প্রথমেই শোকসংবাদ। গত এক বছরের মধ্যে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রের তিন জ্যোতিষ্ক—আশুতোষ কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও অমর ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার-কে হারিয়েছি। আশুতোষ সহধর্মিণী যোগমায়া দেবীও লোকান্তরিত হয়েছেন। আশুতোষ কলেজের সঙ্গে পঞ্চানন সিংহ মহাশয়ের যে সম্বন্ধ তাতে তাঁর মৃত্যুতে প্রথায় আনুগত্যে দু'চার কথায় শোক জানানটা কিছু নয়। এই মহাবিদ্যায়তনের সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ যে রূপের সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত, তার মূলে রয়েছে অধ্যক্ষরূপে স্বর্গীয় সিংহ মহাশয়ের দীর্ঘ বত্রিশ বর্ষব্যাপী (১৯১৬-১৯৪৮) নিরলস সাধনা এবং সংগঠনী প্রতিভা। সুতরাং ভাষায় শোকের উচ্ছ্বাসের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধের অপপ্রচেষ্টা না করে আমরা কেবল এই নিরভিমান অনলস জ্ঞানতাপসের লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করবো। এই প্রসঙ্গে আমরা শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এবং ধর্মপ্রাণা যোগমায়া দেবীর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যেও আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি ॥

** ** **

এবারে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসী লেখক আলবেঅর কামু। এতদিন আমরা দেখেছি যাঁদের সাহিত্য আঙ্গিক ও বক্তব্যের একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতিতে স্থিতি লাভ করেছে, যাঁদের রচনাধারারও বাঁক পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই—'নোবেল কমিটি' তাঁদেরই পুরস্কারে সম্মানিত করেন। অন্তকথায়, সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় দেন। আলবেঅর কামু এর উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। তিনি যে কেবল অল্পবয়সেই পুরস্কার পেলেন তা নয়, তাঁর রচনাও এখনো পরিণত রূপ লাভ করেনি। ১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর অ্যালজিরিয়ার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে কামুর জন্ম হয়। কামুর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সর্বশেষ উপন্যাস 'দি ফল' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে। এই উপন্যাসের পূর্ববর্তী কামুর রচনাবলীতে মানুষ ছিল অপ্রধান। জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলোরই প্রাধান্য তাতে দেখতে পাই। সামাজিক-রাজনৈতিক চক্রান্ত, হিটলারইজম, স্টালিনইজম, যুদ্ধ প্রভৃতি বাহ্যিক ঘটনা ও পরিস্থিতিই আমাদের দুঃখের কারণ। 'দি ফল'-য়েই কামু সর্বপ্রথম মানুষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কামুর সাহিত্য আজ নতুন পথে যাত্রা আরম্ভ করেছে। নতুন জীবন-আদর্শ প্রস্তুতির পথে এই পুরস্কার নিশ্চয়ই তাঁকে উৎসাহিত করবে এবং সাহিত্যে পরিণত-রূপলাভকে করবে ত্বরান্বিত ॥

দত্ত। তাঁদের সযত্ন ও সুষ্ঠু কাজ সবাইকে খুশি করবে বলেই আমা
অনেক কাজের ভিড়েও এই সহযোগিতার জন্য এঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

.. .. ..

পত্রিকাপ্রকাশ এবার সময়মত হয়নি। ফলে নানা অভিযোগ-
সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ বিলম্ব নানা কারণে, যদিও সাধারণ্যে ত
আদৌ আমার অভিপ্রেত নয়। যাই হোক, সময়মত প্রকাশিত না হওয়
আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।

তবে এ প্রসঙ্গে এও বলছি ব্লক ছাপানোর ব্যাপারে নাভানার
মুখোপাধ্যায়ের আত্যন্তিক সহযোগিতা না পেলে এর প্রকাশ আরও পেছি
বিরামবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

.. .. ..

পারিপার্শ্বিকের যতখানি সহায়তায় পত্রিকাকে মনোমত করা যায়,
সাহায্য নানা কারণে পাওয়া হয়ে ওঠেনি। ফলে যা করেছি তাতে ক
পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ নেই। তবে আন্তরিকতার অভাব দিয়ে পত্রিকার অঙ্গহা
বলেই আমার বিশ্বাস এবং সান্ত্বনা।

.. .. ..

অল্পবিস্তর আমরা সবাই যে শিল্পরসিক—কলেজ পত্রিকায় আমা
পরিচয়। আর এই বিশ্বাসকে মনে মেনে নিয়েই প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁ
আছেন তাঁদের আনন্দ। অর্থাৎ রসিকজনে রসপরিবেশনের পরিতৃপ্তি। এ
সেটুকু গ্রহণ করলেই আমাদের পরিতোষ। আর এই সঙ্গে শেষ ক
সম্পাদক হওয়ার মধ্যে দায়িত্ববোধ যেমন আছে—তেমনি তাকে মনো
উপস্থাপন করার মধ্যেও এক সগর্ব আত্মতৃপ্তি থাকা বিচিত্র নয়।
প্রকাশ করতে পেরে আমি দায়িত্বমুক্ত হয়েছি। এখন পাঠকজনের
আমন্ত্রণ পেলেই আমার আত্মতৃপ্তির পালাও শেষ হবে। নমস্কারান্তে।

অ

এ সম্মান লাভ করেছিলেন। ডঃ সেনের প্রতিভা বিদেশে সম্মান লাভ করলো—এতে আমরা গর্বিত।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে ভারত সরকার 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত করেছেন। 'জাতীয় অধ্যাপক'দের কোন বাঁধাধরা কর্তব্য থাকে না। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। এই কারণে আশা করা অসঙ্গত নয় যে বিজ্ঞানক্ষেত্রে অধ্যাপক বসু আগের চেয়ে আরও একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগের সুযোগ পেলেন। তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি॥

তিন॥

শেষের কথায় আবার পত্রিকারই প্রসঙ্গ।

পত্রিকা প্রকাশের অন্তরাল নিয়ে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলবো গতবারের পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়ের কথা। তাঁকে বাদ দিয়ে পত্রিকার কথা চিন্তা করা যায় না। এ ব্যাপারে কেবল যে তাঁর অভিজ্ঞতাই আমার পাথেয় হয়েছিল তা নয়, এ উপলক্ষে তাঁর সংস্পর্শে এসে যে সুমধুর সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার আশ্চর্য স্পর্শ পেয়েছি তাও ভুলবার নয়।

পত্রিকার কাজে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন ও উপাধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্যের নানা উপদেশ পরামর্শও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁদের এই আনুকূল্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এ ছাড়া আর যাঁদের সহযোগিতা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে তাঁরা হলেন অধ্যাপক পরিমল কর, অধ্যাপক সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়।

আর ধন্যবাদ জানাই প্রাক্তন সম্পাদক অসীম সেনগুপ্ত, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, সহপাঠী বন্ধু বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, কল্যাণাশিস্ দাশগুপ্ত, সুজিতকান্তি সুর, অসিত ঘোষ, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিষ্ণুপ্রসাদ মুরারকা এবং তুষার বসুকে। এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সাহায্য ছড়িয়ে আছে পত্রিকার মধ্যে॥

**　　**　　**

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি পেয়েছি রবীন্দ্রপাঠচক্রের সৌজন্যে। পাঠচক্রের কাছে এ কারণে আমি কৃতজ্ঞ। এই সঙ্গে এর শ্রুতিলেখক বন্ধু শতক্রু-শোভন চক্রবর্তীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি॥

এবারে পত্রিকার অলংকরণ করেছেন শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত এবং অর্ধেন্দুশেখর

CALCUTTA UNIVERSITY
BLUES

Top (*left*) : V. P. Singh
Centre : C. M. Gupta (Rowing)
right : R. Banerjee (Football)
Bottom (*left*) : C. Banerjee (Foot-

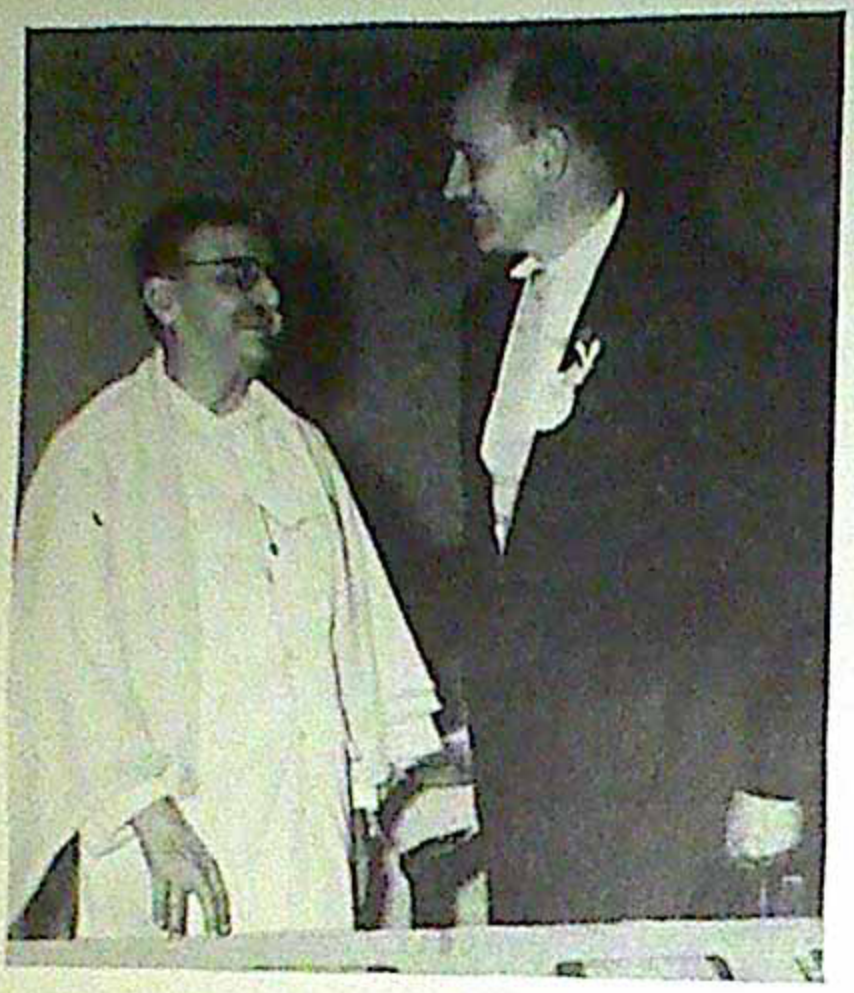

Our President speaking with Mr. Hans Peter Muller, Secretary, Youth Section of UNESCO at a reception held at Asutosh College.

CALCUTTA UNIVERSITY BLUES

Left : S. Banerjee (Rowing)

Right : D. Banerjee (Rowing)

Asutosh College Magazine

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Professor-in-charge

SHRI PARIMAL KAR

Editor

SHRI AJOY GUPTA

Assistant Editor

SHRI NIRMAL RAY

technical know-how and lack of properly equipped man-powe
More serious than any one of these problems is the difficult ta
of bringing about a psychological regeneration among th
people. Fundamentally, therefore, the problem before us
more a human than a technical one.

The Government have not been oblivious of their duty a
Community Development Schemes are being undertaken
larger and larger numbers. The beneficent activities of t
department concerned are sometimes handicapped. Such projec
are guided more often by officials. People of the locality, whe
such schemes are introduced, find men drafted from outside min
tering to their needs and necessities. Local people gradua
become more and more dependent on such outside help ; it
also not rare to find a mental attitude developing which promp
them to think that they have a claim on such outside assistan
and that they can continue to depend not on themselves b
on others. Self-reliance and stimulation of personal effo
as a part of their duty are lacking. There may be exceptio
and fortunately, there are some. But along with the imp
mentation of the Development Projects we must develop t
social consciousness of the people and prompt them to
their bit. In the discharge of this onerous duty voluntary Soc
Work Camp methods are of an inestimable value.

Villages had been the backbone of the social and econon
structure of the Indian society. But in course of the centur
of foreign domination changes were brought about wh
drained the more desirable sections of the village populat
towards urban areas, where standards of health, education a
trade were higher and more alluring. Villages in bygone d
were self-sufficient units where work was worship, and acc
ding to the standard of life then prevailing health and econon
intellectual and religious sufficiency were not wanting. T
social and economic standards were materially affected dur
the long period of subjugation. A country which had l
been rightly deemed to be one of the most developed countr
in the world—economically and intellectually—both from
material and moral points of view—fell on evil days.

The system of Education so long in vogue was not
moulded as to make the educated youths either social-min

Second South East Asia Training Project in Work Camp Methods and Techniques

1st December, 1957

Presidential Address by

Sri Rama Prasad Mookerjee

Chairman, Reception Committee

I consider it to be a unique privilege to have this opportunity of welcoming Work Camp Leaders from different countries of the East and the West as well as from distant corners of this great sub-continent. On behalf of the Reception Committee, on behalf of the Asutosh College, which invited the Project here, and on behalf of myself I extend to you all a cordial and sincere welcome.

Our thanks are due to the Unesco Co-ordination Committee for International Voluntary Work Camps in Paris and particularly to the dynamic personality of its Executive Secretary Hans Peter Muller, for having given the honour to hold here the Second Training Project for South East Asia. To the Ministry of Education in the Government of India and to the Indian Organising Committee we are indebted for financial assistance, for various facilities offered, and for constant advice and guidance.

The Voluntary Work Camp movement was started a few years ago and is now recognised as occupying an important place in the scheme of fundamental education. India which regained its independence only a decade ago has been striving to reoccupy its rightful place in the Comity of Nations and to develop the country in diverse spheres intellectually, materially and socially—keeping in mind the great moral and religious heritage which for ever will remain the bedrock of the superstructure of the future. We have not only to make good the deficiencies of the last few centuries and give to our people a human standard of living, but also to go ahead and run abreast with the rest of the world. In this gigantic task we are faced with problems like lack of finance, lack of material, lack of

It is possible through Voluntary Work Camps to assis national development programmes by stimulating self-help an co-operative efforts in local communities, by making materia improvements, by clearing slums in towns, taking up villag development work, organising programmes of fundamenta education, and by developing a sense of the dignity of manua labour.

Above all, the ideal is to prepare young men and wome for social responsibility, to educate for world-mindedness an international responsibility by sharing with them information o social and international problems and on life in different countrie giving them practice in inter-group and International co operation.

The ideal last mentioned can be fully achieved at this centr during the present session as we have before us about 40 parti cipants half of whom are from India, 15 from South East Asi and 5 from other countries. Countries like Japan, Thailan Indonesia, Malaya, Philippines, Ceylon and Pakistan have partic pated. We have got amongst us specialists on Work Cam methods and fundamental education from the United States America, France, England, Switzerland, West Germany an Holland.

We are meeting today at Fultalla, a township within th Baruipur Development Block, one of the many projects initiate by the Community Projects Administration. This new townshi is surrounded by a number of villages, and the campers wi concentrate their activities in a small Harijan Village, mo of whose inhabitants are landless farm labourers.

To supplement the educational facilities available in th Universities and Colleges and to widen the outlook of teache and students and to provide for them—fundamental educatio the authorities of the Asutosh College availed themselves the opportunities afforded by the Ministry of Education an the Organising Committee.

I acknowledge with all humility the appreciation whic has flowed from the Co-ordination Committee, Unesco, th Ministry of Education and the Development Department the Government of West Bengal for the experimental project i

or to make them familiar with the common man. India also is required to be alert to the words of caution uttered: "It may sound strange to assert that the future of many emergent nations is menaced by education."

Under such circumstances it has now become necessary to inculcate in the people feelings of brotherhood and mutual understanding, to rekindle in them an ardour for discharging social responsibilities and for active participation in service works in a self-reliant spirit, and above all, to "replace the sense of *seva*, denoted by its name, with a sense of co-operation". Let the people feel that the workers who have come to free them from their want and deficiencies are their coequals anxious to cooperate; they do not belong to a superior intellectual hierarchy.

To my mind Voluntary Work Camps have a big role to play in this field. Work Camps bring to rural areas the message of self-help and open up before them the possibilities of a richer and fuller life even within the limitations of their environment. To them the Work Camp is also a call to work. To the urban youth, particularly to students, the Work Camp has an educational significance. It gives a realistic bias to their thinking and establishes the much needed understanding between them and their more unfortunate brethren in rural areas or in slums of big cities. The spade or the shovel has a language which unifies and establishes solidarity and understanding between man and man.

The ideals of workers in Voluntary Work Camps have been enunciated in pregnant terms. One of the aims is to achieve basic human rights for all people and to express a feeling of brotherhood, transcending barriers of creed, caste, race and colour, creating better understanding among young people with different linguistic, national and sectional backgrounds.

It is easy for such workers in India to translate into action the religious beliefs, which are innate even in the humblest and lowest. People are to be told that they can provide an opportunity to serve one's fellow men by developing sensitivity to the problems of the under-privileged, and by helping young people to find practical ways of serving others.

The actual colonization in Africa began in the latter part c the nineteenth century when Stanley returned from Afric and declared that European merchants could make fortune by selling colourful clothes to the naked people.

Then there began an unseemly scramble for land in Afric among European powers. The methods of acquiring coloni were plain and simple. A few bottles of wine, a gun or piece of gaudy trinket were sufficient to induce an Africa chieftain to sign a treaty of which he did know nothing at a And sometimes even this formality also was not observed. Th imperialists often divided the colonies among themselves by ju marking out lines on the map. Thus the Britishers took Egyp a great portion of East, West and South Africa ; the French too the North-Western regions and the island of Madagasca Italy occupied a big part on the shore of the Red Sea, German Portugal, Belgium and Spain partitioned the virgin soil of Afri among themselves. During the First World War the colonies Germany, such as Togoland and Cameroon were annexed England and France. The Dutch settlers called the 'Boe by skilful political manoeuvring gained control of the whc of South Africa. Only Abyssinia and Liberia were someh able to maintain their independence. This was the grim pictu of Africa from the closing years of the nineteenth century dow to the first few years of the twentieth century.

At the present moment there are only 5.5 million whit in the whole of Africa. Yet these handful of outsiders a lording it over millions and millions of natives. The dominati of the white people is based on ruthless exploitation. In ord to expose the shameful nature of this exploitation Chest Bowles quotes the following comment of an African: "When t white man came he had the Bible, and we had the land. No he has the land, and we have the Bible."

The Second World War sounded the death knell imperialism. An upsurge of nationalism swept the Asian cou tries in the wake of this War. On the top of this the emergen of the semi-colonial country China as a powerful social country, and its active co-operation with the U.S.S.R. h definitely split up the world into two rival camps. Now t Western block is facing the powerful Russian block. T

Work Camps and Fundamental Education by the students of Asutosh College under the leadership of Prof. Parimal Kar, who has been selected by the authorities to be the leader of this Camp.

The participants who are imbubed with the ideals of Work Camps are not required to be told that the facilities that we have been able to provide, and arrangements which we have been able to make for the reception and work, are not of the nature of those that are usually provided in conferences in Capitals or big cities. You are to work amongst the people and make all feel a common brotherhood and unity of purpose. Such arrangements as we have been able to make will be in keeping with the nature of your work, and I am sure you will forgive us for any omission or lapses or for any inconvenience which you may feel. You will no doubt appreciate the warmth of our reception and the sincerity with which we extend to you all a hearty welcome in this work of national importance. I wish you all success.

A New Light is spreading over the Dark Continent

Indrajit Sen

"We cannot, under any condition, relinquish our responsibility in helping, in every way possible, in diffusing the light and civilisation into the farthest parts of that virgin jungle."—remarks Gamal Abdel Nasser while he reflects on the situation in Africa. Africa ! which has been described until recently as the 'Dark Continent,' and which has been a happy hunting ground for the Western adventurers for a long time, is at last getting out of its slough of despond. Africa wants freedom, Africa is going to be free. We are living in an era when imperialism is fast decaying, and nationalism is gaining momentum in every part of the world. The present political trend in Africa undoubtedly points to the same truth.

other colonies of the Continent. The Western powers realized from these events that they were losing ground in Africa.

But the colonial powers began to suppress the liberation-movement by terrorizing the colonial peoples. As a reaction to this repressive policy the national movement gathered momentum in Africa. In Kenya the secret Mau-Mau society had resorted to the path of violence and anarchism. In Algeria the nationalists had begun to fight with the French authority, and a mass movement had been launched in South Africa and other parts of this Continent. Only a few days ago civil war broke out in Lebanon for its government's pro-Western attitude. The Government of Iraq is overthrown for the same reason. These two big revolutions in the Middle East, it may be stated, would have a strong repercussion on the Arab countries.

The freedom movement in Africa gained a fresh impetus from the Bandung Conference. In April 1955, twenty nine nations from Asia and Africa assembled at Bandung in Indonesia for the first time in history, to discuss their own problems. President Sukarno, the host, summed up the attitude of this Conference towards colonialism in these words : "Colonialism has also its modern dress in the form of economic control intellectual control and actual physical control by a small but alien community within the nation." And all the delegates to the Conference were at one with the Indonesian President when he said that "wherever, whenever and however it appears colonialism is an evil which must be eradicated from the earth."

The success of Bandung strengthend the anti-colonial powers of the world. The African nations now realized that they would receive both moral and material support from their fellow Asian countries in their struggle against colonialism. In the words of General Romulo : "The suceess of this Conference will be measured not by what we do for ourselves, but by what we do for the entire human community. Our strength flows out of our perception of history and out of the vital purposes we put into the making of tomorrow."

After Bandung the profile of Africa began to change quickly. President Nasser who may be regarded as the idol of Arab nationalism and of African peoples' liberty, snatched away the Suez Canal from the Anglo-French powers and extended Egypt

neutral Asian countries under the leadership of India constitute the third block. They are all against colonialism in any shape or form. These events created a ferment in the Arab world. To add to the complexity of the situation it was through the indirect help and active connivance of England and France that the new Jewish state of Israel came into existence in the Middle East. The Western powers gave it a prompt recognition. The creation of Israel may be compared with the creation of Pakistan ; it is for safeguarding the vested interests of British imperialism. Meanwhile the international situation encouraged the liberty-loving Africans to strike a blow for freedom.

In July 1952, there was a coup d'etat in Egypt, that overthrew the puppet Farouk Government. The causes of this revolt were plain and simple. For years the Egyptian people were groaning under the autocratic rule of the Khedives, who were nothing but toys in the hands of the Britishers. Premier Disraeli purchased a substantial portion of the shares of the Suez Canal for England. This enabled the British slowly but steadily to gain control over the whole of Egypt. They stationed a large army in Egypt. However, the heavy pressure from the people forced the Britishers finally to withdraw from the mainland of Egypt. Yet they together with the French lingered on in the Suez Canal area. Thus they imposed several economic and political restrictions upon Egypt.

King Farouk came to the throne after the death of King Fuad. Like his ancestor Khedive Ismail Bey, he also became notorious for his reckless extravagance. This deepened the economic crisis in Egypt. Taking advantage of this weak economic position the Western powers began to exploit Egypt more shamelessly. These causes combined with the callousness and indifference with which the government conducted the Palestine War led to the outbreak of the revolution of 1952. The Farouk regime was overthrown and a truly national government was established.

Shortly before the Egyptian revolution a national movement started in French North Africa, and after the dramatic intervention of Premier Mendes France in 1954, Tunisia and Morocco gained independence in 1955. The liberation movement rapidly spread to British East and West Africa, to South Africa, and

A man's life is like an impressionist picture made from a series of photographic images. Big things and things apparently small inexplicably imprint themselves upon his mind. The passing faces on a railway platform, or a melody heard from afar, can be as memorable as the emotional storm that agitates our being. If we are to reason why, all the delicate beauty, romance and fascination that make these impressions so sweet and ineffable, will vanish into thin air at the touch of cold reason.

Life is like a rich and delicate fabric woven out of light and shade, smiles and tears; now it is sparkling with laughter, and the next moment it is darkling with sadness. I can never forget the day in New Delhi when the whole of India was plunged into grief at the sudden death of Gandhiji. Accompanied by a few friends I had gone out on the streets to have a last look at Bapuji during his last journey. The route was lined with huge crowds that had come to pay their homage to the Father of the Nation. It was late in the evening that I returned home with a bleeding heart. Just then a friend of mine burst into the room. His face was beaming with joy.

This ill-timed gaiety struck me as very odd. But my friend was in no mood to care. "Raman", he exclaimed, "I feel very happy today because Pandit Nehru brushed against me while I was in the funeral procession". I was a bit puzzled or rather surprised at his 'achievement'. He was thrown into raptures by the mere touch of our Prime Minister. From that time onwards I secretly nursed a desire to meet the Prime Minister and shake hands with him.

I did not, however, realise at the time that for me it was a hope too like despair. To fulfil my ambition apparently proved to be a wild-goose chase. I recollect the day when the Prime Minister came to attend a students' meeting at Kalyani in West Bengal. I made my way to within a few inches of the Prime Minister, but a volunteer pushed me back. I thought I would never get an opportunity.

To-day our Prime Minister has become an international figure; he has attained heights of glory. His principles of peaceful co-existence and Panchashila are a message to the war-torn world. Everywhere people adore him. In the ligh

authority over it. Enraged by this act of Egypt the Anglo-French authorities, along with their puppet Israel, launched their joint attack on Egypt. On the 29th October, 1956, the Anglo-French air and naval forces began to drop cargoes of death and destruction over the mainland of Egypt, and the infantry of Israel met the Egyptian army face to face with pointed bayonets. The whole of Middle East went into action against the intruders. The public opinion in Asia and Africa vehemently condemned this vile attack on Egypt. These countries realized that Egypt was defending not only her own interests but theirs as well. And the aggressors had to retreat in the face of this moral opposition of the people of Asia and Africa.

Following the victory of Egypt the British colony on the Gold Coast gained independence under the new name as Ghana. Sudan had already gained her independence. The whole continent was in a state of ferment.

These post-war developments in Africa show that the age of colonialism is gone. The Bandung Conference has created an atmosphere, which will free the nations of Africa. This atmosphere has been created once again in the recent Afro-Asian Conference in Cairo. At the present moment the heroes of Africa are still fighting for their independence in Algeria, Cameroon, South Africa and in other parts of this Continent.

Africa today is rising; Africa is dynamic. It is high time for the colonial powers to realize that a new light is spreading over this Dark Continent.

An Unforgettable Moment

Raman Bahri

Unforgettable moments there always are in one's life. When we are in a reminiscent mood, the memory of these shining moments flashes upon our mind. If some one were to ask me about some such moments of my life, I can certainly unroll a panorama of scintillating memories.

The Poetry of Wordsworth

Bhupendranath Haldar

Wordsworth is pre-eminently a poet of nature. For him, "Nature seemed to possess a concious soul which expressed itself in the primrose, the rippling lake, or the cuckoo's song with as much intelligence as human lips ever displayed in whispering a secret to the ear of love."

He looks upon Nature as a ministering angel—a friend, philosopher and guide to man, never betraying the heart that loves her. It is her privilege to lead us from joy to joy, thus contributing to the moral health of man. All these aspects of his nature philosophy find their fullest and most satisfactory expression in "Tintern Abbey."

If we go further and study the poems that impress us we shall find four remarkable characteristics :

(1) Wordsworth is sensitive as a barometer to every subtle change in the world about him. In "The Prelude," he compares himself to an Aeolian harp which answers with harmony to every touch of the wind ; and the figure is strikingly accurate, as well as interesting, for there is hardly a sight or a sound, from a violet to a mountain and from the bird-note to the thundering of the cataract, that is not reflected in some beautiful way in Wordsworth's poetry.

(2) Of all the poets who have written about Nature, there is none that compares with him in the truthfulness of representation. Burns, like Gray, is apt to read his own emotions into natural objects, so that there is more of the poet than of Nature in his Mouse and Mountain daisy ; but Wordsworth gives you the bird and the flower, the wind and the tree and the river as they are, and let them speak their own language.

(3) No other poet ever found such abundant beauty in the common world. He had not only sight, but insight, that is to say, he not only sees clearly and describes accurately,

of these facts my project seemed to be quixotic. Yet I continued to cherish a lone hope.

At long last on the 20th of February, 1958 I managed to meet our Prime Minister at his residence. The meeting was arranged by an uncle of mine who was Private Secretary to the Prime Minister. This date has become a most unforgettable event in my life. Language fails to describe my rapture when I shook hands with one who represented the moral conscience of the world. Though I held his hand for a fraction of a second, yet it was a supreme moment in my life—a moment transmuted into gold. It was like that grain of rice turned into gold in the wallet of Rabindranath's beggar. Thus for once in my life I had the supreme privilege of shaking hands with an immortal figure of history. He weilds the destinies of a great people. It has been truly said of him: 'Generations to come...will scarcely believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.'

The few snaps that I took at the moment will always remain a priceless treasure to me. The memory of the moment was woven into the fabric of my being. For me the moment was stretched into eternity.

O Transcendant Life!

Asit Ghosh

O transcendant life ! no more of this mincing poesy ;
Bring now the prose that is stern and harsh.
Let the lilt and jingle of verse be wiped away ;
Deal it a rude hammer blow of prose to-day.
There's no need of the delicious witchery of poetry ;
Poesy, I bid you a long farewell this day.
In the realm of hunger the earth is a grey desert of prose,
And the full moon is as it were a baked bread.

(Translated from the original Bengali poem *He Mahajiban* by the deceased poet Sri Sukanta Bhattacharya)

from Recollections of Early Childhood," Wordsworth sums up his philosophy of childhood. This kinship with Nature and God, which glorifies childhood, ought to be extended through a man's whole life and ennoble it. This is the teaching of "Tintern Abbey" in which the best part of our life is shown to be the result of natural influences. According to Wordsworth, society and the crowded unnatural life of cities tend to weaken and pervert humanity, and a return to natural and simple living is the only remedy for human wretchedness.

(2) The natural instincts and pleasures of childhood are the true standards of man's happiness in this life. All artificial pleasures soon grow tiresome. The natural pleasures, which a man so easily neglects in his work, are the chief means by which we may expect permanent and increasing joy. In "Tintern Abbey", "The Rainbow", "Ode to Duty" and "Intimations of Immortality" we see this plain teaching; but we can hardly read one of Wordsworth's pages without finding *it slipping in unobstrusively* like the fragrance of a wild flower.

(3) The truth of humanity, that is, the common life which labours and loves and shares the general heritage of smiles and tears, is the only subject of permanent literary interest. Burns and the early poets of the age of Romantic Revival began the good work by showing an interest in common life; and Wordsworth continued it in "Michael," "The Solitary Reaper", "To a Highland Girl", "Stepping Westward", "The Excursion" and a score of lesser poems. Joy and sorrow, not of princes and heroes but "in widest commonalty spread" are his themes.

(4) To this natural philosophy of man Wordsworth adds a mystic element, the result of his own belief, that in every natural object there is a reflection of the living God. Nature is everywhere transformed and illumined by the Spirit; man also is a reflection of the Divine Spirit, and we shall never understand the emotion roused by a flower or a sunset until we learn that Nature appeals through the eye of man to his inner spirit. In a word, Nature

but penetrates to the heart of things and always finds some exquisite meaning that is not written on the surface. It is idle to specify or quote lines on flowers and stars, on snow or vapour. Nothing is ugly or commonplace in this world; on the contrary, there is hardly any natural phenomenon which he has not glorified by pointing out some beauty that was hidden from our eyes.

(4) It is the life of Nature which is everywhere recognised; not mere growth or cell changes, but sentient, personal life; and the recognition of this personality in nature chatacterises all the world's great poetry. In his childhood Wordsworth regarded natural objects, the streams, the hills, the flowers, even the winds as his companions; and with his intuitive belief that all nature is the reflexion of the living spirit, it is inevitable that his poetry should thrill with the sense of a spirit that "rolls through all things." Cowper, Burns, Keats, Tennyson—all the poets give you the outward aspect of Nature in varying degrees. But Wordsworth gives you her very life, and the impression of some personal living spirit that meets and accompanies the man who goes alone through the woods and fields. And this suggests another delightful characteristic of Wordsworth's poetry, namely, that he seems to awaken rather than to create an impression: he stirs our memory deeply so that in reading him we live once more in the vague, beautiful wonderland of our childhood.

Such is the philosophy of Wordsworth's nature poetry. If we search now for his philosophy of human life we shall find four more doctrines which rest upon his basic conception that man is not apart from nature, but he is the very "life of her life".

(1) In childhood man is sensitive as a wind-harp to all natural influences; he is an epitome of the gladness and beauty of the world. Wordsworth explains this gladness and this sensitive nature by the doctrine that the child comes straight from the creator of Nature:

In his exquisite Ode on "Intimations of Immortality

appear before us every moment of our life. But are they real or mere illusions? A straight stick, when dipped in water, appears to be bent. Very often we mistake a rope for a snake. It is the business of philosophy to distinguish the true from the false, the real from the illusory. An object perceived by knowledge cannot be altogether false. If we can sift the mixture, we can get at the truth, which may be viewed differently as 'noumenon' *sat* (pure being), Brahman, and so on. If we know the truth adequately so that all doubt is eliminated, it would be ideal knowledge, a realisation of the absolute soul. That is why philosophy is called *'adhyatmika vidya'*. Questions concerning the ultimate nature of the real, the existence of God and His relation to the world, the nature of truth, of goodness and beauty, and the spirit and destiny of beings are the problems of philosophy.

The nature of philosophy can be well understood by contrasting it with science. In ancient days philosophy and science were identical. Then, in course of time, different sciences separated themselves from philosophy and developed in their own way. The marvellous triumphs of science dazzled the vision of man and tried to clip the wings of philosophy. But in its way of progress science reached a point where it became puzzled. Many great scientists are conscious of the inability of science alone to solve the problems that have been posed by atomic fission. They are now reverting to philosophy. Hence we may say that philosophy begins where science ends. Again, science, as we know, is systematised knowledge of a 'particular' department of the universe. But philosophy takes for its subject the 'whole' of the universe. This is why philosophy is often defined as the "synthesis of all sciences." A science starts accepting certain axioms and fundamental concepts. For example, physics takes for granted that matter exists, biology assumes the existence of life. But can they explain what is matter itself, and what is life? These are the questions for philosophy to answer. Science will continue as a theoretical understanding of the world for practical purposes; but it cannot peer into the mystery of being or of ultimate reality. Philosophy claims to do that. So it is the crown of all sciences. To quote Will Durant, "Science is the analytical description, philosophy

must be "spiritually discerned". In "Tintern Abbey" the spiritual appeal of nature is expressed in almost every line, but the mystic conception of man is seen more clearly in "Intimations of Immortality", which Emerson calls "the high-water mark of poetry in the nineteenth century." In this last splendid ode Wordsworth adds to his spiritual interpretation of Nature and man the alluring doctrine of pre-existence which has appealed powerfully to the Hindu and the Greek in turn, and which makes of human life a continuous, immortal thing, without end or beginning.

The greatness of Wordsworth which can never be matched by that of any other poet lies in his message of hope and joy to mankind—in his pointing out to the suffering humanity the great truth that life with all its limitations is livable with happiness by promoting the simple affections and elemental feelings planted in the human heart by Nature.

Reflections on Philosophy

Achintyanath Chattopadhyaya

Philosophy is as old as rationality itself. But Philosophy, as we now understand it, is quite different from what it was in the past. Western philosophy of to-day is the accumulation of thoughts and ideas promulgated by different philosophers at different periods of history. The case of Indian philosophy is different. The germinal thoughts of Indian philosophy can be traced in the Rg Veda and the earlier Upanisads. The six systems were later on evolved out of these basic truths.

The etymological meaning of the word philosophy is love of wisdom (philos = love ; sophia = wisdom). Philosophy is an attempt at gaining an ultimate knowledge of life and the universe as a whole and appreciating the eternal values. It is "Tattva Darsana" or an insight into the heart of the Reality. Objects

Sputniks in Outer Space

Umesh Chandra Gupta

The launching of sputniks creates a sensation in the world of science. It marks a definite advancement in the study of cosmic space. Sputniks that have penetrated into outer space are revolving round the earth. They are man-made devices for studying outer space.

The first artificial earth satellite was successfully launched in outer space by the Soviet Union on the 4th of October, 1957. It was hurled at a distance of 560 miles from the earth. It was a sphere made of aluminium alloys. Its diameter was 58 cm ; it weighed 83.6 kgs. It was filled with gaseous nitrogen. It carried various instruments. Among these there were two radio transmitters which continuously emitted signals that were received at a distance of 10,000 km. So it proved the possibility of establishing systematic radio communication with outer space.

It was launched by a three-stage rocket. In the first lap of its journey a rocket launched the 22-metre long missile up to a precalculated height, and the satellite got 15 p.c. of its orbital speed. In the second lap it got 32 p.c. of its orbital speed. At the third stage the rocket had a hard-fuel engine. The satellite was placed in its nose ; it was sealed behind a protective cone, when the required orbital speed was attained.

The rocket was first launched vertically and then its axis gradually started to curve away from the vertical course and moved parallel to the earth at an altitude of several hundred kilometres and at a speed of 8,000 metres per sec. As soon as the engine stopped, the protective cone was automatically dropped. The satellite separated from the rocket and thus the three bodies, the sputnik, the carrier rocket and the protective cone appeared in space.

Now the question arises, how will it he travelling round the earth ? The answer is quite simple. For the moon is a satellite travelling round the earth at a distance of 380,000 km

s synthetic interpretation. Philosophy seems to stand still, perplexed; but only because she leaves the fruits of victory o her daughters the sciences, and herself passes on divinely liscontent, to the uncertain and unexplored."

Ordinary people often fail to distinguish between philo-sophy and religion in view of the fact that both of them deal with the ultimate. The absurdity of the view is clear from what is discussed above. Philosophy is not religion. Religion consists in the attitudes of concern, devotion or worship and conduct; philosophy, on the other hand, is a rational under-standing. Religion takes practical and emotional attitudes owards the object, while philosophy seeks to define and nterpret it. Religion spontaneously takes God for granted; ut philosophy examines whether there is such a Being or not nd what His nature is. And what is more, the God of religion s not always the same as the God of philosophy.

Every branch of human experience is bound to come to point where it becomes puzzled and perplexed; it bows down to he feet of philosophy which comes to its rescue. Some ungentle eaders often opine that philosophy is a barren intellectual ursuit. It leads us nowhere, but simply confuses our intellect n a labyrinth of high-sounding terms. Against this charge e assert that philosophical study is one of the most essential equirements of a cultured person. Philosophy promises its aithful student a better understanding of the real world, and f the value and purpose of life. "Its aim," observed Dr. Radha-rishnan, "is one of elevating man above worldiness, of making im superior to circumstances, of liberating his spirit from he thraldom of material things."

Science gives us knowledge, but only philosophy can give us isdom. "Science tells us," says Durant, "how to heal and ow to kill, it reduces death rate in retail and then kills us holesale in war." "The time has now come when philosophy hould turn its attention towards the problem of peace"—the ost important problem of the present-day world.

time in the top layers of the atmosphere, experiments previously unthinkable. Scientists also carried on investigation of the short-wave ultra-violet radiation of the sun, and the cosmic radiation that thus originated the opportunity of investigating outer space at great distances away from the earth and even from the solar system itself.

EXPLORER I : The United States launched its first sputnik named 'Alpha '58' on 1st February, '58 by a four-stage version of the U.S. Army's test rocket, Jupiter-C to a height of 1587 miles above the surface of the earth after a failure on the 4th of December '57 due to the explosion of its carrier rocket as soon as it was launched.

Alpha was officially described as a bullet-shaped tube about 78 inches long, 6 in. wide weighing 30·8 lbs, including 11 lbs of radio transmitters and instruments to measure outer and inner temperatures, and cosmic rays etc., with 11·7 lbs. of a final-stage rocket. It completes one full revolution in 115 min. at a speed of 1800 mph. Its life is estimated at between 2½ and 10 years.

EXPLORER II and III : The U. S. Army launched a second explorer type satellite with a Jupiter-C rocket on the 5th March '58, but it tumbled down. Explorer III weighs 31 lbs and is expected to be in orbit from 4 to 6 months.

VANGUARD I : After two failures, one on the 17th Dec. '57 by the explosion of their Jupiter rocket at the launching place, and the other on the 5th Feb. '58, when the Vanguard space rocket exploded in mid-air over the Atlantic, 60 seconds after being launched with a 3½ lbs satellite, the United States Navy was successful in launching the tiny 6-inch satellite by the Vanguard space rocket on the 17th March, 58. It is whirling round the earth and its life is estimated to be at least 200 years. One of its radio transmitters went dead on the 5th April '58, but the other was functioning well, and its life is estimated at between 2½ and 10 years.

SPUTNIK III : Russia launched her sputnik III on 15th May'58. It is conical in shape and is nearly 12 ft. in length with a weight of 2925.5 lbs of which solar batteries and instruments

Thus the motion of the man-made satellite in outer space is also governed by the same laws as the motion of the earth and other planets round the sun. At present these laws as based on the 'Universal Law of Gravitation'. This motion may as well be compared to the motion of a stone whirled round at the end of a string, the other end of which is held in the hand. In this case the string remains constantly tense and this force depends on the stone's velocity, which increases with its acceleration. If we compare this motion with the motion of the satellite, the string takes the place of earthly gravitation. So we can say that it moves in its orbit without expenditure of energy. It has no engine. It travels solely due to the velocity imparted to it by the carrier rocket.

SPUTNIK II: It was launched about one month after the first sputnik on the 3rd November, 1957 to mark the 40th anniversary of Russion Revolution. It was about six times heavier than Sputnik I, and was placed at a distance of 1062 miles from the earth. New sources of power were used to project Sputnik II. It contained instruments for the investigation of cosmic radiation, the ultra-violet and X-ray regions of the solar spectrum, and a hermetically sealed chamber with the dog Laika inside, radio telemetering equipment for relaying results of measurements, and radio transmitters etc. Its orbit was bigger and further away than that of Sputnik I and so the period of its revolution was also greater being 103.7 min. at the beginning.

This sputnik proved that human beings can travel in outer space as Laika maintained normal life in the hermetically sealed chamber in outer space for about 10 days and then died due to lack of oxygen. The chamber had an airconditioning arrangement with some stock of food inside. Along with this it had also equipment for recording the pulse-beat, breathing and blood pressure and also instruments for measuring certain other conditions like temperature and pressure.

The research programme involved in the taking of measurements by Sputnik II was to cover a period of 7 days. The sputnik's radio transmitters, radio telemetering equipment had stopped working. The further tracking of the motion of Sputnik II enabled scientists to conduct several experiments for the first

The Report of the Students' Union 1957-1958

Our Achievements

The history of the Asutosh College Students' Union for the last six months has been a record of great achievements. It is the sole aim of the Students' Union to make it an organisation of the students. It is for our fellow students to judge how far we have succeeded in fulfilling this great mission.

The newly elected Students' Union Council took over on December 5, 1957. The charge was handed over at a solemn ceremony held under the Chairmanship of Prof. Sisir Kumar Das.

The Cheap Stores

The outgoing Council had been forced by circumstances to close down the cheap stores run by the Students' Union. The new Council had to cross a number of hurdles before they could manage to reopen the stores. Nevertheless, scarcity of paper seriously interfered with the normal working of the stores.

Netaji Birthday and Saraswati Puja

As in previous years, the Netaji Birthday and the Saraswati Puja were celebrated jointly by the Students' Unions of the three Departments with due solemnities. In this connection I acknowledge with gratitude the unstinted help and co-operation that we received from all concerned.

A Windfall

It had been a long-felt grievance of the students of the three Departments of Asutosh College—that they were not allowed to frame their own annual budgets. The authorities have since been kind enough to recognise this fundamental right of the students. The budgets have accordingly been framed in all Departments. A scrutiny of the budget revealed that a sum amounting to about Rs. 3000/- was being annually deducted from the games fund. Similar deductions were also

weigh 2133 lbs. The new one and a half-ton sputnik circled the earth once every 106 minutes at a height ranging from 150 to 1,175 miles. Prof. Feodorov said Sputnik III "resembles a motor-car." He said its great weight and size have made it possible for it to be converted into "an automatic flying laboratory." He added that scientists used "common chemical fuels," and not atomic energy, to launch Sputnik III. Russia's third and largest sputnik would stay in orbit several months longer than Sputnik II which survived for more than 5 months.

SPUTNIKS NO MORE: All except the first two Russian sputniks and America's Explorer II are in outer space. The first Russian sputnik plunged into earth's atmosphere on the 4th Jan. '58. The second Russian sputnik plunged into earth's atmosphere early on the 14th April '58 and fell somewhere on the east coast of U. S. A.

A TRIP TO THE MOON: The information provided by the three Russian sputniks has lessened the hopes of scientists that man may soon attempt a flight to the moon; for cosmic radiation has even a greater intensity in outer space than hitherto thought of. One must also remember that the temperature on moon's surface rises to 120°C during the day and drops to roughly 160°C below zero at night. Sputnik III was large enough to carry a man, but to put a man into space at the moment was premature as scientists have to study the problem of how to bring a sputnik or a part of the sputnik back to earth. It should also he noted that in order to launch still larger satellites into space it will be necessary to overcome a number of additional difficulties. Therefore, all further launchings of satellites will largely depend upon how science tackles the problem of ensuring saefty to men travelling in outer space. A solution of this basic problem will greatly contribute to the success of the interplanetary voyages that man is likely to undertake in no distant future.*

*This article is based on materials collected from the books and newspapers that I have read.

ASUTOSH COLLEGE FOOTBALL TEAM

WINNERS, ELLIOT SHIELD AND HEROMBA MOITRA SHIELD, 1957

Sitting from Left : P. N. Paul (Games Secy. 57-58), P. Sen, Prof. P. K. Roy, Vice-Principal N. K. Bhattacharjee, Prof. B. N. Chakravorty (Prof. in-charge of

Raman Bahri, a student of Third Year B. Sc. Class of Asutosh College, paying his respects to Prime Minister Nehru.
(The article on Page 103)

ASUTOSH COLLEGE DARSHAN PARISHAD, 1958

ting Left to Right : P. Maitra (Vice-President), Prof. K. Bakshi, Prof. M. Mukherjee (President), Prof. S. P. Banerjee (President Students' Union), Prof. S. Ganguly, B. Haldar (General Secretary).

Standing Left to Right : A. Ghosh, P. Ghosh, A. Chatterjee, S. Lahiri, M. Ali Mallick, M. Banerjee, S. Das Gupta.

College Hall. This will add to the floor space of the existing Common-Room. Arrangements have also been made to increase the number of books, periodicals and newspapers in the Common-Room.

The Library

Now that the College has been split up into three separate and independant units, it is only to be expected that our library will receive greater attention from the authorities. It should be in a position to meet the essential requirements of the students. It gives me great pleasure to note that at the suggestion of the Students' Union our Principal has kindly agreed to establish a text-book library for needy students. He has also agreed to extend the library hours from 6 p.m. to 9 p.m.

The Assistant Editor of the College Magazine

On a representation being made by the Students' Union the authorities have agreed to appoint an Assistant Editor for the College Magazine.

Symposia

We took a decision to organise symposia to educate our fellow students about the socio-economic conditions of our society. But the scheme fell through for lack of support from proper quarters.

External Activities

Our Students' Union was effectively represented in the West Bengal Secondary Education Bill movement. In order to safeguard the interests of the Students' Community our Students' Union called upon the Students' Unions of other colleges in West Bengal to form a federation of all the Students' Unions.

The Students' Health Home

For the last few years this Home has been rendering a valuable service to the ailing students of Calcutta. Our Students' Union lends its wholehearted support to the aim and objects of the Home.

eing made from the Common-Room fund. Students brought is matter to the notice of the authorities. It is a matter f sincere gratification to us that the authorities have very indly passed orders for stopping these deductions.

he College Canteen

It was through the efforts of my predecessor that the ollege Canteen was removed to a spacious room. The good-ill and hearty co-operation of the College authorities enabled im to make it a cheap canteen. Unfortunately, insufficient urniture has proved to be a serious handicap. Our Principal as kindly agreed to see that the canteen is provided with dequate furniture.

ur New Constitution

The new Constitution of the Students' Union, which mbodies the hopes and aspiration of the students, was duly dopted by the Students' Union Council on 12. 8. 58. We ope that this constitution will get the necessary approval nd sanction from the authorities.

tudents' Aid Fund

For making collections for the above fund a charity film how is going to be organised under the auspices of the Students' Jnion.

eminars

The Students' Union has approached the authorities for rganising seminars in different subjects.

ultural Activities

This year we tried to organise an orchestra party. But ur attempt proved a failure. During the last spring social ur Union succeeded in inducing some artists from outside to ake part in our function.

Our Common-Room

At the instance of the Students' Union the College autho-ities have kindly agreed permanently to remove the reading oom section of the Common-Room to the balcony of the

5

The Report of Sports and Games

Ever since the charge of sports and games was entrusted to me, I have tried my level best to uphold the glorious tradition of our college in the sphere of sports and games. During this period under review a remarkable change was effected in the administration of this section. Sri Biswanath Chakravarty, who had been the Professor-in-charge of games for the last few years, having relinquished his office, Sri Pravat Kumar Roy took up the responsibility. I feel happy to state that though Sri Chakravarty has retired, he has been rendering valuable service to this section. As a matter of fact he is our friend, and guide.

Though constitutionally Asutosh College Athletic Club is a body subordinate to the Asutosh College Students' Union, it was separated from the Students' Union a few years ago. I am trying my level best to get the above constitution implemented.

This year the Athletic Club has been allowed to frame their own budget. I am glad to announce that one of the long-felt grievances of the students of our college has thus been removed. Again it was at the request of our Union that the authorities very kindly agreed to stop the deduction of Rs. 3000/- that was being made from the fund of this Department for many years. This money will now be utilised for providing better amenities to the students. This is surely a great achievement to our credit.

Annual Sports

The annual sports of our College were held on 13th and 14th February, 1958 on our College ground. The function was presided over by Sri N. K. Ghose, Chairman, University Sports Board. Sri Someswar Prosad Mukherjee, ex-Principal of our College, kindly graced the occasion with his presence as the chief-guest. The occasion was celebrated with befitting solemnity, pomp and grandeur. There was a keen contest among the competitors for making a fine display of excellent sportsmanship. In a number of cases the competitors squarely broke the five

Protest against the enhancement of tuition fees

Our Students' Union has recorded its protest against the enhancement of tuition fees in some of the colleges of Calcutta.

Conclusion

Thus during the period under review our Students' Union has tried in its own humble way to tone up the life of the students of Asutosh College. Our achievements in different spheres of activity are mainly due to the hearty co-operation and ungrudging support that we have received from our fellow students. We acknowledge with gratitude that their ardour and enthusiasm has been a perennial source of inspiration to me and my colleagues of the Students' Union.

The things that we have hitherto achieved are surely remarkable. But we must not remain satisfied with them; we must press forward. The future beckons us; we must project ourselves into the future. This conviction has grown upon me that the patronage and moral support of our fellow students will light our path and lead us from victory to victory.

Before bringing this report to a close I express my profound sense of gratitude to Principal K. N. Sen and Vice-Principal N. K. Bhattacharyya for the hearty co-operation, sound advice, and wise guidance that we have consistently received from them. I also acknowledge the deep debt of gratitude that we owe to our outgoing President, Prof. S. K. Das. We are glad to learn that he is shortly proceeding to U.K. for further studies. It is now my pleasant duty to pay our respects to our new President, Prof. Sankari Prasad Banerjee. Though he has held his post for the last few days only, he has by his sweet reasonableness already endeared himself to the members of the Students' Union.

Lastly, I offer a hearty welcome to the freshers who have just joined the College.

Asit Bhattacharya
General Secretary.

losing a single point we went up to the group-championship final game. Unfortunately, circumstances beyond our control forced us to withdraw our team both from the league and knock-out tournament.

Rowing

We maintained our high reputation in Rowing. We the winners of the Inter-Collegiate knock-out (fours) for last three years, were defeated by the St. Xaviers College by a very narrow margin of one length. I must mention here the names of Sri Dilip Kumar Banerjee (Captain) Sri. Supriya Banerjee (Bow) and Sri C. N. Gupta (Cok). They took great pains to train up our College crew.

Athletics

A team of nine athletes represented our College in the Inter-Collegiate Athletic Championship and we won three places.

University Blues

It gives me much pleasure to announce that a number of players of our College got the University Blues for the current year. They are, Chandan Banerjee (Football), Ranjit Banerjee (Football), Vikram Protap Singh (Football), Kirit Ghose (Cricket), Dilip Banerjee (Rowing), C. N. Gupta (Rowing), Supriya Banerjee (Rowing).

In this session twelve Blazers have been sanctioned to the following players of our College : Vikram Protap Singh, Chandan Banerjee, Ranjit Banerjee, Sreekanta Banerjee, Babul Roychowdhury, Inder Boksi, Kirit Ghose, Dilip Banerjee, Chandra Mohan Gupta, Asim Kumar Biswas, Pronab Roychowdhury, Dulal Dey (1957).

The remarkable success that we have achieved this year, and did in the past, is all due to the energy and grit shown by the students who participated in different games as also to the members of the staff and the general body of students, who cheered and encouraged them. The kind patronage that was extended and the valuable suggestions that were offered to us by our Principal Sri K. N. Sen, Vice-Principal Sri N. K. Bhattacharjee, Sri P. Sen, Senior Professor of Physics, deserve special mention.

revious records, viz., those in Javeline and Discuss throwing, Broad Jump, in Hop-Step and Jump and Shot-Put. The indi-idual championship was won by Sri Hemen Karmakar, a econd year science student. The success of the function was rgely due to the members of Asutosh College Students' Union ouncil, and St. John Ambulance of our College. After the nction every student and the assembled guests were treated light refreshment. Last of all we acknowledge our gratitude Sri D. K. Chowdhury, Capt. P. K. Chowdhury, Sri Santo Pul, ri Samar Paul Sri Bhaba Ranjan Roy, Sri Ramanuj Roy, ri Bimal Chanda and Nilmoni Das of Bangabasi College who elped us in various ways.

ootball

Our football team added another glorious chapter to the istory of our College sports and games. We have won both the eramba Maitra and the Elliot Shields for two successive years. his was all due to the players like R. Banerjee, S. Banerjee, . Mitra, V. P. Singh, I. Boksi, B. Roychowdhury and Pradip en Gupta. I am sure that these players will try their level best retain the Shields for three successive years, and thus set up ecords in the history of the Inter-Collegiate Football Tourna-ents. I request our beloved teachers and students to be resent on the ground to encourage our players.

ricket

In cricket also our achievement this year was quite remark-ble. We went up to the group-championship final in the league. fter the group-championship we were defeated by the ity College (Commerce) by a narrow margin. This year the nock-out tournament was adjourned. It was a matter of great easure to us that the well-known cricketer Phadkar has ent his valuable time by coaching our players. He was ghly pleased with Kirit Ghose and Sri V. N. Chaturbedi. hese two players were selected to represent the Calcutta niversity team in the Inter-University tournament held at llahabad.

ockey

In Hockey our achievement this year was very impressive nd remarkable. We started with a gallant spirit and without

we hope that the warm sympathy and the enthusiastic support of our fellow students will enable the Parishad to survive and function in a proper manner. I shall conclude this report with hearty thanks to my fellow students for the help and co-operation that we have received from them.

Bhupendra Nath Haldar
General Secretary

"...Indian philosophy is an epitome of all philosophies. For the Indian mind was more concerned about thought than action, about insight rather than behaviour. Certainly its profound tolerance for thinking permitted every viewpoint to be entertained."

—*Gerald Heard*

Last of all I acknowledge a deep sense of gratitude to all ny colleagues and specially to the players of the various sec-ions who assisted me in all possible ways.

Pramatha Nath Paul
Games Secretary

The Report of the Darshan Parishad 1957-1958

The students of Philosophy at Asutosh College have of late rganised an association called the Asutosh College Darshan arishad. The object in view with which this association as been started, is to organise seminars on popular as well s academic topics of Philosophy. It is patronised by our evered teachers, Prof. Motilal Mukherjee, Prof. Sankari rasad Banerjee, and Prof. Kalipada Bakshi. Their advice nd patronage have been our mainstay. Their blessings and oodwill have lighted our path. In this connexion I cannot ut mention the name of Prof. Sankari Prasad Banerjee ; his aluable speeches and teachings will live in our memory for long time to come. The outgoing Secretary Samsul Huq, nd Pradip Maitra have tried heart and soul to place this rganisation on a firm footing. We are glad to announce hat our infant organisation has been recognised by our tudents' Union. It is also a matter of gratification to us o note that during the short period of its existence the arishad has organised several seminars on divers topics. The ost important of these seminars was presided oren by Prof. miya Mazumdar, the late Head of the Department of Philo-ophy, Presidency College.

It is sad to contemplate that in the past an organisation f this kind was formed. Unfortunately, it died a premature eath. This fills our hearts with misgivings. Nevertheless,

austere simplicity of his ways of life inspired awe and veneratio
Beneath the rugged exterior of an easy irascibility he was
mass of warm-hearted and genuine manhood. His laughter w
like the laughter of the gods ; it radiated the calm serenity
his soul. He took his M.A. degree in English, Economics a
History. He was suckled in the creed of nationalism. Af
passing the M.A. Examination in 1905 he became a profes
at the National College. He lived a dedicated life, a
possessed a superb sense of duty. He was an institution
himself. His death is a distinct loss to the world of education
West Bengal. We pay our homage to the memory of t
great teacher and noble soul.

* * * *

The death of Lady Jogamaya Mookerjee, the widow
the late Sir Asutosh Mookerjee, comes as a severe shock
us. She was 83. For more than three quarters of a centu
the pageant of the history of Bengal and India with all its col
and romance, its pomp and circumstance had unfolded its
before her very eyes. Her death marks the passing away
a great age. She was renowned for her piety and religi
austerities. The ancient ideals of Hinduism and its sac
rituals were woven into her very being. Even when she w
bowed down with age and infirmities she made arduous p
grimages to various holy places of India. The last years
her life were darkened by a terrible calamity. The martyrd
of her illustrious son, Dr. Syama Prasad Mookerjee, in far-
Kashmir, dealt a cruel blow to her. It was a tragedy too d
for tears. The excruciating agony of a mother's bleed
heart found a most poignant expression in the pathetic le
that she wrote to the Prime Minister of India on that oc
sion. We offer our tribute of respect and reverence to this l
of hallowed memory who embodied in herself the nob
ideals of Indian womanhood. May her soul rest in eternal pe

* * * *

In the death of Sir Jadunath Sarkar at the ripe old ag
86 years India loses one of the greatest historians of all ti
His monumental works on Sivaji and Aurangzeb have m
his place secure among such immortal historians as Herod

itorial Notes

s great College crosses another milestone in its career glory ; it now steps into the forty-third year of its existence. e year 1958 is, however, a turning point in the history of this itution. The proposals for introducing the U.G.C. Scheme, making a phased reduction of the roll-strength of the College 1500, and for introducing the Three-Year Degree Course 1961, are now under the active consideration of the autho- s concerned. Momentous changes in the world of education in the offing. It is difficult to visualise at this stage the e of things to come. In order to meet the exigencies of situation, that is likely to develop in the near future, the ning and the Evening Departments of our College have been rated from the parent body. They have now been affiliated ndependent colleges. The former is called Asutosh College Women, and the latter Asutosh College of Commerce. But not the sequel of this decision unsolder the goodliest wship of students and teachers that has developed through -three long years. Let us remember our common heritage feel a communion of spirit.

* * * *

It is with deep feelings of sorrow and bereavement that received the news of the death of Principal Panchanan a. He passed away on December 9, 1957 at the age of ears. He was Principal of Asutosh College for thirty-two . His long association with this College made him, as it , a part of this institution. Just as an immemorial banyan interweaves its fantastic roots with the structure of an nt temple of Siva in the countryside of Bengal till the and the temple become one entity, so the spirit of cipal Panchanan Sinha merged its identity in the lofty ideals which this College stood. The magnificent building e College was his handiwork ; it was constructed under ersonal care an supervision. He was like the guardian of this great temple of learning. The leonine grandeur figure and appearance, the benignity of his looks, and the

Geography ; *Australia, 5th ed.*—G. Taylor ; *Geography of Europe*—G. W. Hoffman ; *British Isles*—A. Demangun ; *Asia's Lands and Peoples*—G. B. Cressey ; *North America*—N. J. G. Pounds ; *Southeast Asia*—E. H. G. Dobbey.

Philosophy : *Main problem of Philosophy*—Sushil Kumar Maitra ; *Philosophy of Realism*—H. Lotrye ; *Principles of Psychology*—W. James.

English : *Little Treasury of American poetry*—ed. by—O. William ; *Short Stories*—Hemmingway ; *Long days journey into Night*—E. O'Neill ; *Achievement in American Poetry, 1900-1950*—L. L. Bogan ; *Literature of United States, Vols. 122*—W. B. Theodore ; Ternysm—F. L. Greces ; John Eryden, B. Dobree ; *Introduction to 18th Century Drama, 1700-1780*—F. S. Boas ; *Pamela, Vols. 122*—S. Richardson.

Economics & Politics : *Hand book of Labour Laws & Industrial Relations, Vols. 122*—R. N. Bose ; *Central Banking after Bagehot*—R. S. Loyans ; *Principles & problems of Modern Economics*—W. A. Kaivisto ; *Keynesian Revolution*—L. R. Klein ; *Welfare & Competitives*—T. Scitovsky ; *Report on Currency & Finance for the year 1956-57* ; *International Monetary Policy*—W. M. Scammell ; *Indian Parliament*—A. B. Lal ; *Accumulation of Capital*—R. Luxenburg ; *Outline of Monetary Economics*—A. C. L. Day.

History : *Modern Europe up to 1945*—C. D. Hazen ; *History and Culture of the Indian Peoples, Vol. 5*—R. C. Majumdar ; *Sepoy Mutiny*—Haraprosad Chattopadhya ; *Europe in the 17th Century*—D. Ogg ; *Sepoy Mutiny and Revolt of 1857*—R. C. Majumdar.

Bengali : সাহিত্য দীপিকা—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ; চিন্ময় বঙ্গ—ক্ষিতিমোহন সেন ; বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ; বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুত গোস্বামী ; বাংলার পত্র সাহিত্য—সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ; রবীন্দ্র কাব্যালোক—অমিতা মিত্র ; সমাজ ও ইতিহাস—সুশোভন সরকার ; বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ—নীলরতন সেন ; বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি—গোপাল হালদার।

citus, Gibbon and Mommsen. By virtue of his vast erudi-
n and amazing versatility he could breathe life into the dry
nes of historical facts. He had a prophet's vision ; he looked
on history as the unfoldment of a divine purpose. Our
utation to this illustrious son of India.

* * * *

Maulana Abul Kalam Azad's death is a great calamity for
ia. He had been intimately associated with India's struggle
independence ever since he was a young man of 30. He was
of the greatest of Muslim divines and a most distinguished
lu scholar. He was for many years the President of the
ian National Congress during that hectic period when it
engaged in a life-and-death struggle with British imperialism.
a will for ever cherish the memory of this valiant fighter
India's freedom.

* * * *

It is a matter of sincere gratification to us that Prof.
N. Bose and Prof. Krishnan have been appointed National
fessors by the Government of India. This is a fitting re-
aition of the splendid services rendered to science by
e two savants.

* * * *

It gives us great pleasure to note that Prof. Subratesh Ghosh
he Department of Economics of our College has been
itted to the D. Phil degree of the Calcutta University on his
s. "The Problems of Trade-Unionism in the Under-
loped Countries". Prof. Ghosh's thesis has been highly
en of by his examiners. This is an honour done to our
ge. We offer our sincere felicitations to Dr. Ghosh.

* * * *

n bringing out Vol XXXIII of our College Magazine we
received unstinted help, sympathy and guidance from
quarters. We acknowledge our deep debt of gratitude to
ipal Khagendra Nath Sen and Vice-Principal Nirod Kumar
acharya for the valuable advice they have tendered and
iberal patronage they have consistently extended to us.
Parimal Kar, professor-in-charge of our Magazine, Prof.

The St. John Ambulance Brigade (India), District No. II West Bengal.
Asutosh College Ambulance Division, Annual Inspection—1958.

Sitting on ground, From L. to R.: P. Chakravarty, Sgt. T. K. Das, Capt. A. Banerji, N. C. Sil, U. Mukherji, K. B. Roy, A. K. Paul, B. Chakravarty, P. K. Chakravarty, B. Mittra, Sgt. M. K. Chakravarty, D. Sengupta.

Sitting on Chair, From L. to R.: A/o, S. K. Mukherjee, Div. Supdt. A. R. Dutta, Div. Surgeon Dr. P. K. Ghosh, Dist. officer D. P. Mittra, Vice-Principal N. K. Bhattacharjee, Dist. Supdt. Dr. P. C. Roy, Principal K. N. Sen, Dist. officer R. N. Ghosh, Secy. Gov. Body J. M. Mazumder, A/o. P. K. Roy.

Standing 1st Row, From L. to R.: J. Banerji, B. N. Dutta, Cpl. S. Chatterji, Cpl. A. Das, M. K. Basu, Cpl. T. K. Dutta, B. Jana,

Important Additions to Our Library

Physics : *Heat* Nelkon ; *Numerical examples in Physics*—A. N. Puri ; *Treatise on Electricity & Magnetism, Vols. 122*—J. C. Makwell ; *Text book on practical Physics*—K. G. Mazumdar ; *Electricity & Magnetism*—C. J. Smith ; *Principles of Electricity*—L. Page and N. J. Adams ; *Electricity and Magnetism*—C. Ashford.

Chemistry : *Advanced Inorganic Chemistry*—Satya Prakas, Tuli and S. K. Basu ; *Outlines of Inorganic Chemistry*—Priyadaranjan Roy ; *Text of Organic Chemistry*—B. S. Baul ; *Studies in Inorganic Chemistry*—B. K. Goswami ; *Practical Physiological Chemistry 13th ed*—P. B. Hawk B. L. Oser & W. H. Summerson ; *Living Body, Text in Human Physiology*—C. H. Bert & N. B. Taylor ; *Principles of Human Physiology*—C. L. Evans ; *Organic Chemistry, Vol. II*—J. L. Finar.

Mathematics : *Advanced Algebra, Vols. 1, 2 & 3*—C. V. Durell ; *Numerical Mathematical Analysis*—J. B. Learborough ; *Key to Analytical Geometry*—J. M. Kar ; *Determinants & Metrics*—A. C. Sitken ; *Integral Calculus*—Santinarayan ; *Differential Calculus*—Santinarayan ; *Introduction to Calculus*—J. M. Kar ; *First Course in Calculus*—Maity & Bagchi ; *Modern Astronomy*—P. C. Chaudhury.

Statistics : *Statistical Calculation for Beginners*—E. G. Chaubey ; *Charity Statistics*—M. E. Spear ; *Basic Statistical Concets*—J. K. Adams ; *Statistics for Economics & Business*—D. W. Paden & E. F. Lindquist ; *Fundamental Principles of Mathematical Statistics*—H H. Wolfenden ; *Methods of Statistics*—L. H. C. Tippeth.

Botany, Zoology : *Text book of Theoretical Botany, Vol. I*—R. C. McLan & W. R. Irmey Cook ; *Text book of Plant* ; *Physiology* : Shri Ranjan ; *Text-book of Plant Physiology*—P. L. Kochhar ; *College Zoology*—R. W. Hegher & K. R. Stiley ; *Functional Anatomy of Vertebrates*—D. P. Quiring ; *Invertebrates Vols. III & IV*—L. H. Hyman ; *Story of Animal Life Vol. 122*—M. Burton.

Geology : *Petrography*—H. W. Franin, J. Turuce & C. M. Gilbert ; *Outlines of Structural Geology*—E. S. Hills ; *Geology*—A. Raistrick ; *Geologic Field Methods*—J. W. Low ; *Petrology for Students*—A. Harker ; *Evolution of Igneous Rocks*—N. L. Bowen.

उनका खून उबल पड़ा। वह चन्द्रशेखर के क्रांतिकारी दल में, एक कठिन परिक्षा में सफलता प्राप्त कर, शामिल हो गए। उनकी निर्भयता अत्यन्त सराहनीय थी।

खुदीराम से बिस्मल तक के शहीदों की कुर्बानियाँ उन्हें जोश दिलाती थीं। उन्होंने मरते समय जो वाक्य कहे थे, "हम भारती के खून को मत भूलना यारो...।" इन्हें हमेशा ही निडर बनाये रखते थे।

एक समय उन्होंने कहा था:—

"देश की खातिर अगर,
यह प्राण चले जायें,
हमें मंजूर है यह गर,
यह देश आजाद हो जाये।"

और, देश की आजादी के लिये मैं अपना खून कर सकता हूँ—परन्तु अपने वतन का नहीं।

जब कभी लोग उन्हें कहते थे कि 'आप यदि ऐसे हिंसात्मक कार्य करेंगे तो सरकार गाँव जला देगी, लोगों पर और जुल्म करेगी।' तब वह जोशपूर्ण शब्दों में कहा करते थे कि इनक़ाब करने वाले इन बातों से डरते नहीं—क्रान्ति की चक्की यह नहीं देखती कि गेहूं के साथ घुन क्यों पिसा जा रहा है।"

उन्होंने अनेक बड़े-बड़े कार्य किये। वह उस स्थान में भी चले जाते थे, जहाँ कड़ा पहरा रहता था। जब उन्होंने देखा कि भारतीयों का जोश कुछ ढीला पड़ रहा है तो उनमें पुनः जोश भरने के लिये अपने प्राणों की बलि देनी ही उचित समझी। उन्होंने असेम्बली में बम फेंका, परन्तु उस स्थान पर जहाँ कोई न था। क्योंकि उनका प्रमुख कार्य लोगों में उत्साह दिलाना मात्र ही था। जब उन्हें गिरफ्तार कर जज के सामने लाया गया तो उसने पूछा—'तुम्हें, मालूम है इसका क्या अन्जाम होगा? उन्होंने उस समय दिलेरी से कहा—हाँ जानता हूं। एक देश से मोहब्बत करने वाला पैरों के तले रौंद दिया जायगा, देश की स्वतंत्रता के लिये बगावत करने वाला फाँसी पर लटका दिया जायगा। परन्तु मुझे गोली से भी उड़ा दिया जाय तो दुःख नहीं होगा।

फाँसी के तख्ते पर जाते समय उन्होंने देश प्रेमियों से कहा—'मुझे फाँसी के बदले आँसू नहीं खून चाहिये। देश से अत्याचारियों को भगाने के लिये शान्ति नहीं बगावत चाहिये।' यह कहते हुए वह वीर शिरोमणि फाँसी के तख्ते पर झूल गए और अपनी याद हमारे लिये छोड़ गए।

॥ जयहिन्द ॥

Sitting from Left : Cpl. B. Dey, Sgt. T. N. Swami, C. H. M. Ram Lall, Lt. K. S. Chatterjee, Vice-Principal N. K. Bhattacharjee, Capt. P. Chatterjee, O. C. "B" Coy., Sub. G. Singh, R. S. M. N. Chanda, Nk. M. Singh, C. S. M. P. Chakraborty, Sgt. B. P. Roy, Cpl. B. Sircar.

Standing First Row from Left : Cdts. S. Banerjee, S. Paul, Amit Biswas, S. Ganguly, P. Dutta, A. Biswas, C. Das, R. Ghosh, P. Sinha, M. Chakraborty, G. Chatterjee, K. Sen.

Standing Second Row from Left : Cdts. D. Ghosh, R. Paul, A. Bhunia, S. Nath, P. Ghosh, T. Roy, R. Biswas, A. Banerjee, P. Bhattacharjee, D. Chakraborty, R. Char.

Standing Third Row from Left : Cdts. P. Banik, K. Dutta, A. Bhattacharjee, J. Bose, R. Bose, A. Mukherjee, P. Sen, S. Bhattacharjee, S. Roy, Kamal Dutta, R. Roy, A. Bhattacharjee.

उक्त डेलावार के अद्भुत कैमेरे पर कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति के रक्त-बिंदु का चित्र लिया गया, उसकी बड़ी आँत में साधारण सूजन आ गई थी। साथ ही एक पूर्ण स्वस्थ आदमी के रक्त-बिंदु का चित्र लिया गया। दोनों का चित्र विकसित करके देखा गया तो रोगग्रस्त आँतड़ी झुकी हुई, काले धब्बों के साथ सफेद रंग की दिखाई पड़ी और दूसरे की भी झुकी हुई किन्तु बिना काले धब्बों की। यह काले धब्बे ही रोग की निशानी है।

गत वर्ष बहुत से डाक्टरों ने इस कैमेरे के प्रयोग से ज्ञात रोग-लक्षणों की प्रचलित जाँच-पद्धति (रक्तपरीक्षण, एक्स-रे आदि) द्वारा प्राप्त परिणामों के साथ मिलान किया था और उन्हें शत-प्रतिशत सही पाया था।

सबसे आश्चर्य की बात इस कैमेरे की यह है "विकीर्ण-तेजः शक्ति" इसको ग्रहण करने की शक्ति, जिसका प्रमाण उसके द्वारा प्रभावित चित्र स्वयं होता है।

कहना नहीं होगा कि, इस नये वैज्ञानिक सिद्धांत के स्थिर हो जाने के बाद न केवल रोगपरीक्षण, किन्तु अन्य वैज्ञानिक कार्यों पर भी इसका निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। 'रेडीयेशन' के सिद्धान्त का ही यह परिणाम है कि, हम रेडियो-फोटो, रेडियो-ध्वनि, बेतार सम्वाद-वहन आदि अद्भुत वैज्ञानिक सुविधाओं से सम्पन्न हो सकते हैं। और, यह तेजोविकिरण को भी मात करनेवाली रेडियस्थेसिया कौन जाने 'मन में सोची गयी बातों' की भी छवि एक दिन हमारे सामने उपस्थित कर दे!*

* संक्षिप्त अनुवाद

तेरी मस्जिद, मेरा मन्दिर ॥ "बुद्धदेव"

तू सिजदा कर, मैं नत होऊँ
तू दे आजान, मैं शंख भरूँ
तू पश्चिम से उसको पुकार—
मैं प्राची से उसको सुमरूँ,

तू आयत पढ़ कुरान खोल
मैं वेद मंत्र का पाठ करूँ
तू कह अल्लाह रहीम उसे,
मैं रामकृष्ण शुभ नाम धरूँ।

अल्ला ईश्वर के विश्वासी
हम एक धरा के अधिवासी
इस एक गगन के साये में
तेरी मक्का, मेरी काशी;

आशुतोष कालेज पत्रिका

त्रयस्त्रिंश खण्ड ❀ १९५८

अमर शहीद भगत सिंह ॥ विष्णु प्रसाद मुरारका

भारत को स्वतन्त्रता दिलाने का श्रेय अधिकांश लोग गांधीजी को देते हैं। इनका कहना है कि गांधीजी की अहिंसात्मक नीति अपनाने के कारण भारत को स्वतन्त्रता मिली। यह ठीक है। परन्तु भारत के उस समय के क्रांतिकारी आन्दोलन को भूल जाना भी उचित नहीं है। मेरे विचार से तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने का अधिक श्रेय उस क्रांतिकारी दल को ही है जिसके बहुतेरे सदस्यों ने देश की आजादी के प्रयत्न में हँसते-हँसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खुदीराम बोस, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि उसी दल के गणमान्य सदस्य थे। इन लोगों के साहसिक कार्यों को देखकर आश्चर्य चकित रह जाना पड़ता है। खुदीराम बोस ने केवल १७ वर्ष की उम्र में ही घर-बार त्याग कर देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया था। उस वीर नौजवान की गाथा कौन भूल सकता है? उसके अदम्य साहस की कहानी किसे आश्चर्य में न डाल देगी? चन्द्रशेखर आजाद की कूटनीति, शत्रुओं को धोखा देने की चालबाजियाँ, चरम कोटि का पौरुष प्रदर्शन आदि देख कर कौन ऐसा भारतीय नागरिक होगा जो गर्व से फूल न उठे? सरदार भगत सिंह भी उन्हीं नौनिहालों में एक थे। बालकपन में ही यह देश भक्ति के गीत गुनगुनाते रहते थे। १८५७ के शहीदों का खून जिसने ब्रिटिश सरकार का शृंगार किया था, और जलियाँवाले बाग की खून से रँगी लाल धरती जहाँ हमारे निहत्थे हजारों बालक, वृद्ध, जवान शहीद हुए थे उन्हें जोश में डालती थीं, यही घटनाएँ उनके माथे में हमेशा चक्कर लगाया करती थीं। इसलिये जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार अत्याचारों की सीमा लांघ चुकी है तो

के कुत्ते के लिये जो अभी थोड़ी देर पहले ही मरा था। तो क्या वह उस कफन की चोरी कर ले। नहीं . शीघ्र ही उसके विचारों ने पलटा खाया। वह इतनी नीच नहीं हो सकती। वह अपने लाल को कुत्ते के कफन का कम्बल उढ़ायेगी? नहीं ...कदापि नहीं.....। पर शीघ्र ही फिर विचार बदला। कौन देखता है? आखिर मेरा लाल तो बच जायगा। यह विचार कर वह चल पड़ी।

× × ×

रजनी देवी ने अपने मस्तक पर निर्मल चन्द्र का टीका लगाया, और झिलमिलाते हुए सितारों से जटित नीलाम्बर धारण किया। इठलाती हुई जब वह पृथ्वी पर चरण रखने लगीं तो सारा संसार उनके सौन्दर्य से मोहित होकर उनकी गोद में आश्रय लेने लगा। पर शीला को इस रात्रि में आश्रय कहाँ? वह एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी थी। उसका सम्पूर्ण शरीर सर्दी से अकड़ रहा था। चार आदमी गड्ढा खोदकर एक कुत्ते को मिट्टी में दबा रहे थे। एक नया कम्बल पास में पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। थोड़ी देर में वह उसे दबा कर चले गए शीला अपनी जगह से थोड़ी खिसकी और चुपचाप कदम बढ़ाती हुई कम्बल के पास पहुंची। उसके हृदय के अन्दर फिर अन्तर्द्वन्द प्रारम्भ हो गया। चोरों की तरह डरते-डरते कम्बल उठाया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। वह कम्बल लेकर भागी, इतनी तेजी से मानो उसे पकड़ कर कोई जान से मार डालेगा।

शीला तेजी के साथ झोपड़ी में घुस गई। जाते ही कम्बल से उसने अपने लाल को अच्छी तरह ढँक दिया। व्याकुल होकर उसने जैसे ही कम्बल हटा कर देखा तो वह बेहोश हो गयी।

खाद उत्पादक सिन्दरी ॥ रामजन्म सिंह

भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ की ७०% जनता कृषि उत्पादन पर ही अपना जीवन व्यतीत करती है। परन्तु बढ़ती हुई आबादी एवं उत्पादन शक्ति के ह्रास के कारण ऋण से लदे हुये किसान आज दाने-दाने को मुहताज हैं।

इन सब संकटों को दूर करने के लिए सरकार कमर कस कर तैयार है। उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिये सरकार बहुत सचेष्ट है तथा खेतों में डालने के लिये अच्छे से अच्छे खाद के बनाने की कोशिश कर रही है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय

क अंतर्द्रष्टा कैमेरा ॥ जिनेन्द्रकुमार नवलखा

क्सफोर्ड के एक वैज्ञानिक इंजीनियर श्री देलावार ने एक ऐसे कैमेरे का र्माण किया है, जो हमारे रक्त की बूंद का बहुत बड़ा चित्र लेकर हमारे शरीर के र्ण अवयवों की स्थिति का परिचय करा देता है। उक्त इंजीनियर का कहना —"यदि कोई डाक्टर मेरे पास किसी रोगी के रक्त का नमूना भेज दे और कहे अमुक अवयव की परीक्षा करके बतायें; इसमें अमुक रोग के लक्षण वर्तमान हैं कि तो यह नया कैमेरा उस अवयव की वास्तविक स्थिति का चित्र लेकर उस न का सही उत्तर दे सकता है। रोग द्वारा प्रभावित अंश नेगेटिव पर अंकित जाता है। रोगी के वहाँ उपस्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं।"

यह कैमेरा बड़े आकार का बाक्सनुमा बना हुआ है, जिसके एक ओर बहुत टे बक्स की शक्ल का रोशनी फेंकने का माध्यम—फोकसिंग चेम्बर—और तीन फ तीन (ट्यूनिंग) डायल लगे हुए हैं। पूरा ढाँचा धातु के बने चार छड़ों पर ड़ा हुआ है।

इसमें चित्र लेने का तरीका इस प्रकार है—पहले उंगली के पोर से रक्त कालकर फिल्टर पेपर पर उसे सुखा लिया जाता है। चित्र लेने के समय इसी ल्टर पेपर को बाक्स के सबसे उपरी सिरे पर लगा दिया जाता है और एक धारण फोटो—ग्राफिक प्लेट फोकसिंग चेम्बर के उपर वाले हिस्से में लगा दी ती है। चित्र खींचने के लिये कैमेरे के निचले भाग में आकाश-व्याप्त स्वर तरंगों मदद से प्रतिध्वनि की स्थिति उत्पन्न की जाती है। इसके निर्माता का कहना कि इस विधि से 'प्रकृति में हर क्षण में विकीर्ण होती हुई तेजः—शक्ति' (रेडी एनर्जी) फोकसिंग चेम्बर से होकर गुजरती है और प्लेट पर प्रतिबिंबित होती इसके बाद दस सेकेण्ड तक प्लेट पर रोशनी फेंकी जाती है। फिर उसे धारण चित्र की तरह डेवलप कर लिया जाता है। चित्र लेने की यह विधि चित्र प्रतीत होती है, विशेषकर उसमें प्रतिध्वनि की स्थिति उत्पन्न करके (एनर्जी) रने की बात। किन्तु यही तो इस कैमेरे की सबसे बड़ी विशेषता है। इंजी-यर देलावार की सूझ का सबसे बड़ा चमत्कार यही है। इस नवीन अविष्कृत दान्त का नाम है रेडियस्थेसिया।

आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि ताप या प्रकाश के रूप में त सर्वत्र विकीर्ण होता रहता है और प्रत्येक जीवनमय के अवयवों में रहता है। डियस्थेसिया इसके आगे का कदम है।

Carbonate मिल जाता है और यह अन्य कारखानों में सीमेंट बनाने के काम आता है।

इस कारखाने में अब Ammonium Sulphate अधिक मात्रा में तैयार कि जाता है और इसलिये इसे बाहर से मंगवाने की आवश्यकता नहीं होती। भा सरकार ने इस खाद उत्पादक कारखाने का निर्माण कर एशिया में एक प्रशंसनी कार्य किया है।

इस खाद से भारत की उपज बढ़ेगी। यहाँ दूर-दूर से छात्र केमिकल इंजी यरिंग के अध्ययन के लिये आयेंगे। वास्तव में यह भारतीयों के गौरव की ब होगी।

हैं नाम एक सब काम एक
हैं कौन बड़ा छोटा लघुतर ?
हिन्दु जलते, गड़ते मुस्लिम
मिट्टी-मिट्टी में क्या अन्तर ?

तू जर्रे जर्रे में करीम का
व्यापक जलवा देख रहा
मैं मीरा के गिरधर नागर के
स्मित की सुन्दर रेख, अहा !

तुम करो दुआ—मेरे मन्दिर की
स्वर्ण कंगूरा बुलन्द रहे;
मैं करूँ याचना ईश्वर से
मस्जिद तेरी निर्द्वन्द रहे।

कफन की चोरी ॥ प्रकाशचन्द्र मोदी

संध्या की ढलती हुई लालिमा ने पर्वत माला पर कंचन बिखेर दिया। घाटियों की प्रत्येक वस्तु सुनहले रंग से रंजित हो गयी। प्रकृति के इस रूप पर मुग्ध होकर सरिता ने इस मनोरम दृश्य की छाया अपने हृदय में अंकित कर ली। सर्दी अपने पूर्ण यौवन पर आना चाहती थी। शीला अपने छोटे से घर में अभी बैठी ही थी। उसके दिल में अरमान थे और उसके मस्तिष्क में, था एक भीषण तूफान ।

उस घर में वह थी और उसका लाल, बस यही उसका परिवार था। बच्चे की हालत ज्वर के कारण चिन्ताजनक थी। वह अपने लाल को अपने पति की अमानत को पूर्ण सुरक्षित रखना चाहती थी। पर घर में एक फटी दरी और एक फटे कम्बल के अलावा वस्त्रों के नाम पर और कुछ नहीं था। और पैसे..... ...वह बड़े साहब श्री दयाल बाबु के यहाँ काम करती थी पर समयानुसार काम पर न पहुँचने के कारण वह काम छूट गया था—तो पैसे कहाँ से आते। वह स्वयं सर्दी सह सकती थी पर अपने लाल को सर्दी से कैसे बचाये—वह क्या करे—कपड़े कहाँ से लाये यही प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। अभी वह वैद्यजी के पास से होकर आई थी, उसके कान में बराबर वैद्यजी के ये शब्द गूँजने लगे 'बच्चे को सर्दी से बचाना बहुत ही आवश्यक है'।

सहसा वायु के प्रचण्ड झोंके के समान उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि बड़े साहब का नौकर एक नया कम्बल बाजार से लेकर आया था..... ...बड़े साहब

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

LIST OF EDITORS—1924-1958

Prof. Mohini Mohon Mukherjee (1924); Basudev Banerjee (1925) Bibhas Roy Choudhury and S. Raghavachari (1926); Subodh Biswa Dhiren Lahiri and Satiranjan Banerjee (1927); Sasi Bhusan Bari and Kalyan Kumar Sen Gupta (1928); Asoke Kumar Banerjee an Shyamapada Mukherjee (1929); Prabhat Kumar Bose and Kausi Kumar Mitra (1930); Shyamapada Mukherjee and Prafulla Kuma Sarkar (1931); Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterjee an Batto Krishto Banerjee (1932); Hari Prasanna Chakravarty an Prabhat Sen (1933); Govinda Roy and Anil Kumar Chakravart (1934); Binoy Ghosh and Basanta Ghosal (1935); Devaprasa Bhattacharya, Santosh Mitra and Miss Bani Roy (1936); Devaprasa Chatterjee, Narahari Kaviraj and Miss Bani Roy (1937); Santos Bose and Miss Pratima Banerjee (1938); Subrata Sarkar and Mis Nirupama Banerjee (1939); Ramkrishna Maitra and Miss Alak Guha (1940); Sanat Ghosal and Miss Lila Maitra (1941); Subhend Banerjee and Miss Kshama Banerjee (1942); Samir Basu and Mis Purabi Banerjee (1943); No publication owing to 'Paper Economy (1944); Asim Bhattacharya, Amiya Mukherjee, Jibendra Sinha Roy Ranendranath Bose, Miss Kamala Dutt and Miss Indira Bose (1945) Editor-in-chief: Pijuskanti Chatterjee, Arun Kumar Dasgupta, Nares Chandra Ghose, Suhas Kumar Roy, Ramaprasad Chakravarty Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar and Miss Sriman Chakravarty (1946); Editor-in-chief: Sobhanlal Mukherjee, Aru Mukherjee, Asoke Sen Gupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly Sukumar Banerjee and Miss Pushpanjali Sen (1947); Editor-in-chief Tejen Guha Roy, Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Das Gupta Pratul Bardhan Roy, Prithwish Roy Choudhury, Pranakrishna Bhatta charya and Bireshwar Banerjee (1948); Satyen Mukherjee and Mis Jayasree Choudhury (1949); Madhusudan Ghose (1950); Arun Kuma Roy (1951); Smritibikash Ghose (1952); Dulal Das (1953); Gopa Chandra Banerjee (1954); Samarendra Sen Gupta (1955); Ashim Se Gupta (1956); Malaya Sankar Das Gupta (1957); Ajoy Gupta (1958

खाद उत्पादक सिन्दरी

भारत बहुत ही कम पैमाने में कृत्रिम खाद तैयार करता था, परन्तु आज की परिस्थिति को लक्ष्य कर भारत के लिये ज्यादा कृत्रिम खाद की आवश्यकता है। जुलाई सन् १९४३ में Food Grains Policy Committee ने भारत सरकार को हिदायत दी थी कि भविष्य में उपज बढ़ाने के लिये कम से कम २ या ३ करोड़ टन कृत्रिम खाद की प्रतिवर्ष आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब भारत में बड़े-बड़े कृत्रिम खाद तैयार करने के कारखाने बनें। इस प्रकार भारत के उद्योगिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति होगी तथा बेकारों को काम मिलेगा।

अतः सन् १९५१ के नवम्बर के महीने में भारत सरकार ने Ammonium Sulphate तैयार करने का एक बहुत बड़ा कारखाना २३ करोड़ रुपये की लागत से बिहार के सिन्दरी गाँव में खोला। यह कारखाना सिन्दरी नाम से विख्यात है। यह दामोदर नदीके तीर पर अवस्थित है। यह एशिया महादेश में अपने जोड़ का अकेला है। जिस समय सिन्दरी कारखाने का निर्माण हुआ उस समय पानी की सबसे बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई, क्योंकि कृत्रिम खाद तैयार करने के लिए कमसे कम ५ करोड़ गैलन पानी की आवश्यक्ता थी।

इस समस्या के हल के लिये भारत सरकार ने Ad-hoc Committee बैठाई। Ad-hoc Committee ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये मुख्यतः ३ चीजों की जरूरत है।

प्रथमः—गोवाई नदी और दामोदर नदी के मुहाने पर एक बाँध बाँधा जाय जो सिन्दरी से ४ मील पर मिले।

द्वितीयः—दामोदर नदी के अंचल पर एक ऐसी नहर बने जिसमें पानी जमा किया जा सके तथा जब दामोदर नदी का पानी घटने लगे तो उसे काम में लाया जाय।

तृतीयः—कुछ उपयोगी नदियों के तीर पर पम्प चलाए जायं। इस प्रकार पानी की समस्या हल की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और गोवाई नदी पर एक बाँध बाँध कर एक तालाब बनाया गया जिसमें ७०० से १००० करोड़ गैलन पानी इकट्ठा किया जा सकता है।

अब इस कारखाने में जीपसम द्वारा १००० टन प्रति दिन Ammonium Sulphate तैयार किया जाता है। जिससे साथ ही करीब १२०० टन Calcium

॥ লেখক প্রসঙ্গ ॥

বাংলা

অনুপ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ অসীম সেনগুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্র॥ বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ অমলেন্দু শূর, প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান॥ শতভ্রশোভন চক্রবর্তী, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ উৎপলকুমার বসু, প্রাক্তন ছাত্র॥ মলয়শংকর দাশগুপ্ত, চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য॥ সত্যধন ঘোষাল, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ বাসুদেব গুপ্ত, চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য॥ কল্যাণাশিস্ দাশগুপ্ত, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ প্রদীপ মৈত্র, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ কালীপদ রায়, দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ প্রেমেন্দু বসু, তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান॥ প্রশান্ত ধর, দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥ নির্মলকুমার রায়, প্রথম বর্ষ। সাহিত্য॥ নির্মলেন্দু দত্ত, তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান॥ দুর্গাশংকর পাণ্ডা, প্রথম বর্ষ। সাহিত্য॥ দিবোন্দু রায়চৌধুরী, তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য॥

ENGLISH

Indrajit Sen—Third year, Arts; Raman Bahri—Third year, Science; Asit Ghosh—Third year, Arts; Bhupendranath Haldar—Third year, Arts; Achintyanath Chattopadhyaya—Third year, Arts; Umesh Chandra Gupta—Third year, Science.

হিন্দী

বিষ্ণু প্রসাদ মুরारका, প্রথম বর্ষ। কলা॥ জিনেন্দ্রকুমার নবলখা, প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান॥ বুদ্ধদেব, প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান॥ প্রকাশচন্দ্র মোদী, প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান॥ রামজন্ম সিংহ, প্রথম বর্ষ। কলা॥